অষ্টম অধ্যায়

কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা

শ্লোক ১

সূত উবাচ

অথ তে সম্পরেতানাং স্বানামুদকমিচ্ছতাম্।
দাতুং সকৃষ্ণা গঙ্গায়াং পুরস্কৃত্য যযুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **অথ**—এইভাবে; **তে**—পাণ্ডবেরা; **সম্পরেতানাম্**—মৃতদের; **স্বানাম্**—আত্মীয়দের; **উদকম্**—জল; **ইচ্ছতাম্**—অভিলাষ করে; **দাতুম্**—প্রদানের জন্য; **সকৃষ্ণাঃ**—দ্রৌপদীসহ; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গায়; **পুরস্কৃত্য**—অগ্রে রেখে; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, তারপর পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ করার মানসে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীসহ গঙ্গাতীরে গমন করলেন। মহিলারা অগ্রভাগে যাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

যখন পরিবারের কারো মৃত্যু হয়, তখন গঙ্গা বা অন্য কোন পবিত্র নদীতে স্নান করার প্রথা হিন্দু সমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে। পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে পরিবারের প্রতিটি সদস্য এক ঘটি গঙ্গাজল অর্পণ করেন এবং স্ত্রীলোকদের পুরোভাগে রেখে তাঁরা সারিবদ্ধভাবে গমন করেন। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে পাণ্ডবেরাও সেই প্রথা অনুসরণ করেছিলেন। পাণ্ডবদের মামাতো ভাই হওয়ার ফলে সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছিলেন।

শ্লোক ২

তে নিনীয়োদকং সর্বে বিলপ্য চ ভৃশং পুনঃ।
আপ্লুতা হরিপাদাব্জরজঃপূতসরিজ্জলে ॥ ২ ॥

তে—তাঁরা সকলে; নিনীয়—দান করে; উদকম্—জল; সর্বে—তাঁরা প্রত্যেকে; বিলপ্য—বিলাপ করে-, চ—এবং; ভৃশম্—অতিশয়; পুনঃ—পুনরায়; আপ্লুতাঃ—স্নান করেছিলেন; হরিপাদাব্জ—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; রজঃ—ধূলি; পূত—পবিত্র; সরিৎ—গঙ্গার; জলে—জলে।

অনুবাদ

তাঁদের জন্য বিলাপ করে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে গঙ্গাজল অর্পণ করলেন এবং গঙ্গায় স্নান করলেন, কেননা সেই জল পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা মিশ্রিত হয়ে পবিত্রতা লাভ করেছে।

শ্লোক ৩

তত্রাসীনং কুরুপতিং ধৃতরাষ্ট্রং সহানুজম্।
গান্ধারীং পুত্রশোকার্তাং পৃথাং কৃষ্ণাং চ মাধবঃ ॥ ৩ ॥

তত্র—সেখানে; আসীনম্—উপবিষ্ট; কুরুপতিম্—কুরুরাজ; ধৃতরাষ্ট্রম্—ধৃতরাষ্ট্র; সহ-অনুজম্—তাঁর অনুজদের সঙ্গে; গান্ধারীম্—গান্ধারী; পুত্র—পুত্র; শোকার্তাম্—শোকে অভিভূত; পৃথাম্—কুন্তী; কৃষ্ণাম্—দ্রৌপদী; চ—ও; মাধবঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

সেখানে কৌরব-নৃপতি মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর অনুজ ভ্রাতৃবর্গ এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও দ্রৌপদীসহ শোকাভিভূত হয়ে বসেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেখানে ছিলেন।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল একই পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে, এবং তাই তার ফলে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন আত্মীয়—যেমন মহারাজ

যুধিষ্ঠির, এবং তাঁর ভাইয়েরা, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং তাঁর পুত্রবধূগণ প্রমুখ। সমস্ত মুখ্য মৃতব্যক্তিরা কোন না কোন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, এবং তাই সেই পারিবারিক শোক ছিল সংযুক্ত। কুন্তীর ভ্রাতৃষ্পুত্ররূপে পাণ্ডবদের মামাতো ভাই, এবং সুভদ্রার ভ্রাতা ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সেই পরিবারের একজন সদস্য। তাই ভগবান তাঁদের সকলের প্রতি সমান সহানুভূতিশীল ছিলেন, এবং তাই তিনি যথাযথভাবে তাঁদের সান্ত্বনা দিতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৪

সান্ত্বয়ামাস মুনিভির্হতবন্ধূঞ্ শুচার্পিতান্ ।
ভূতেষু কালস্য গতিং দর্শয়ন্নপ্রতিক্রিয়াম্ ॥ ৪ ॥

সান্ত্বয়াম্ আস—সান্ত্বনা দিয়েছিলেন; **মুনিভিঃ**—সেখানে উপস্থিত মুনিগণসহ; **হত-বন্ধূন্**—যাঁরা তাঁদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের হারিয়েছিলেন; **শুচার্পিতান্**—শোকে কাতর সকলকে; **ভূতেষু**—প্রাণীদের; **কালস্য**—পরম নিয়ন্তার পরম নিয়ম; **গতিম্**—প্রতিক্রিয়া; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করেছিলেন; **ন**—না; **প্রতিক্রিয়াম্**—প্রতিকারের উপায়।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমানের দুর্বার বিধি-নিয়মাদি এবং জীবের উপরে সেগুলির প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং উপস্থিত মুনিগণ আর্ত ও শোকাভিভূত সকলকেই সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় পরিচালিত হয় যে প্রকৃতির কঠোর নিয়ম, তা কোনও জীব পরিবর্তন করতে পারে না। সমস্ত জীব নিত্যকাল সর্বশক্তিমান ভগবানের অধীন। ভগবান সমস্ত বিধি-নিয়ম সৃষ্টি করেন, এবং এই সমস্ত বিধি-নিয়মকে সাধারণত বলা হয় ধর্ম। কেউই কোন ধর্মের সূত্র সৃষ্টি করতে পারে না। সদ্ধর্ম হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ পালন করা। ভগবানের নির্দেশ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বিঘোষিত হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য কেবল তাঁকে অথবা তাঁর আদেশকে অনুসরণ করা, এবং সেটিই তাঁদেরকে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়েই সুখী করবে। আমরা যতক্ষণ জড় জগতে রয়েছি, ততক্ষণ আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের আদেশ পালন করা;

আর ভগবানের কৃপায় আমরা যদি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি, তা হলে আমাদের মুক্ত অবস্থায়ও আমরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আমাদের দিব্য প্রেমময়ী সেবা নিবেদন করতে পারি। আমাদের বদ্ধ অবস্থায়, চিন্ময় দৃষ্টির অভাবে, আমরা ভগবানকে দর্শন করতে পারি না, এমনকি নিজেদেরও দর্শন করতে পারি না। কিন্তু আমরা যখন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের শাশ্বত চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হই তখন আমরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে এবং নিজেদেরও দর্শন করতে পারি।

মুক্তি মানে হচ্ছে জাগতিক জীবনের ধারণা ত্যাগ করে চিন্ময় স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। তাই মানব জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে এই চিন্ময় মুক্তি লাভের জন্য যোগ্যতা অর্জন করা। দুর্ভাগ্যবশত, মায়ার মোহময়ী প্রভাবে, আমরা কয়েক বছরের ক্ষণস্থায়ী এই জীবনকে আমাদের শাশ্বত অস্তিত্ব বলে বরণ করি, এবং তার ফলে মায়ার মিথ্যা প্রকাশস্বরূপ তথাকথিত দেশ, গৃহ, ভূমি, সন্তান-সন্ততি, পত্নী, সমাজ, সম্পত্তি ইত্যাদির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এইভাবে আমরা মায়ার নির্দেশে আমাদের এই সমস্ত মিথ্যা কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রাম করি। দিব্য জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে এই সমস্ত জড় বিষয়গুলির সঙ্গে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই, এবং তৎক্ষণাৎ আমরা জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হই। বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিদের অন্তরের গভীর প্রদেশে চিন্ময় শব্দ-তরঙ্গের সঞ্চার করে সমস্ত শোক এবং মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম যে ভগবদ্ভক্ত, তাঁর সঙ্গ প্রভাবে মায়াচ্ছন্ন জীবের ভ্রান্তি তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। এটিই হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধিরূপে প্রকাশিত জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের প্রভাবে ক্লিষ্ট জীবের সান্ত্বনা লাভের পরম উপায়। যুদ্ধের প্রভাবে পীড়িত কুরুবংশের সদস্যরা মৃত্যুজনিত সমস্যার কারণে শোক করছিলেন, এবং ভগবান তখন জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

সাধয়িত্বাজাতশত্রোঃ স্বংরাজ্যং কিতবৈর্হৃতম্ ।
ঘাতয়িত্বাসতো রাজ্ঞঃ কচস্পর্শক্ষতায়ুষঃ ॥ ৫ ॥

সাধয়িত্বা—সাধন করে; **অজাত-শত্রোঃ**—যাঁর কোন শত্রু নেই; **স্বম্ রাজ্যম্**—নিজের রাজ্য; **কিতবৈঃ**—ধূর্তদের (দুর্যোধন এবং তার গোষ্ঠী) দ্বারা; **হৃতম্**—অপহৃত; **ঘাতয়িত্বা**—বিনাশ করে; **অসতঃ**—দুষ্ট; **রাজ্ঞঃ**—রাণীর; **কচ**—কেশগুচ্ছ; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **ক্ষত**—হ্রাস; **আয়ুষঃ**—আয়ু।

অনুবাদ

ধূর্ত দুর্যোধন এবং তার দলবল অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কপটতাপূর্বক অপহরণ করেছিল। পরমেশ্বরের কৃপায় তার পুনরুদ্ধার কার্য সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং দুর্যোধনের সাথে যে সমস্ত অসৎ রাজারা যোগ দিয়েছিল, তাদেরও পরমেশ্বর বধ করেছিলেন। রাণী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করার ফলে যাদের আয়ু ক্ষয় হয়েছিল, তাদেরও মৃত্যু হয়েছিল।

তাৎপর্য

কলিযুগের আবির্ভাবের পূর্বে গৌরবময় দিনগুলিতে সমাজে ব্রাহ্মণ, গাভী, স্ত্রী, শিশু এবং বৃদ্ধদের যথাযথভাবে রক্ষা করা হত।

১) ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার ফলে আধ্যাত্মিক জীবন লাভের সবচাইতে বিজ্ঞানসম্মত সংস্কৃতি বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থা রক্ষিত হয়।

২) গাভীদের রক্ষা করার ফলে অলৌকিক খাদ্য দুধ পাওয়া যায়, যা মনুষ্য জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কোষসমূহ সংরক্ষণ করে।

৩) স্ত্রীলোকদের রক্ষা করার ফলে সমাজের পবিত্রতা সংরক্ষিত হয়, যার ফলে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য সুসন্তান লাভ হয়।

৪) শিশুদের রক্ষা করার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মনুষ্য জীবনকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রদান করা হয়। শিশুদের রক্ষা করার এই ব্যবস্থার শুরু হয় জন্মের প্রারম্ভেই, গর্ভাধান সংস্কারের মাধ্যমে।

৫) বৃদ্ধদের রক্ষা করার ফলে তাদের মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠতর জীবন লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। এই পূর্ণতর দৃষ্টিভঙ্গি মানব জীবনকে সার্থক করার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই সভ্যতাটি কুকুর-বিড়ালের মতো জীবন যাপন করার পাশবিক সভ্যতার ঠিক বিপরীত। উপরোক্ত নিরীহ ব্যক্তিদের হত্যা করা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ, এমনকি যদি তাদের অপমানও করা হয়, তাহলেও মানুষের আয়ুক্ষয় হয়। কলিযুগে তাদের যথাযথভাবে রক্ষা করা হয় না, এবং তাই এই যুগে মানুষদের আয়ু ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে স্ত্রীলোকদের যথাযথভাবে রক্ষা না করা হলে সমাজে অবাঞ্ছিত সন্তান উৎপন্ন হয়, যাদের বলা হয় বর্ণ-সঙ্কর। সতী রমণীকে অপমান করার ফলে মানুষের আয়ু বিপন্ন হয়। দুর্যোধনের ভাই দুঃশাসন, আদর্শ সতী দ্রৌপদীকে অপমান করেছিল, এবং তার ফলে সেই দুরাত্মাকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। ভগবানের কঠোর নিয়মের কয়েকটি উল্লেখ এখানে করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

যাজয়িত্বাশ্বমেধৈস্তং ত্রিভিরুত্তমকল্পকৈঃ ।
তদ্যশঃ পাবনং দিক্ষু শতমন্যোরিবাতনোৎ ॥ ৬ ॥

যাজয়িত্বা—সম্পাদনের দ্বারা; **অশ্বমেধৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞ; **তম্**—তাঁকে (মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে); **ত্রিভিঃ**—তিনটি; **উত্তম**—উৎকৃষ্ট; **কল্পকৈঃ**—যথাযথ উপাচার এবং দক্ষ পুরোহিতদের দ্বারা অনুষ্ঠিত; **তৎ**—সেই; **যশঃ**—খ্যাতি; **পাবনম্**—অতি পবিত্র; **দিক্ষু**—সর্বদিক; **শতমন্যোঃ**—শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র; **ইব**—মতো; **অতনোৎ**—বিস্তার করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তত্ত্বাবধানে তিনটি সুসম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়েছিলেন, এবং তার মাধ্যমেই শত যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্রের মতো যুধিষ্ঠির মহারাজের ধর্ম-খ্যাতি সর্বদিকে মহিমান্বিত করে তুলতে প্রণোদিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এটি মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ভূমিকার মতো। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তুলনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের থেকে হাজার হাজার গুণ বেশি, তবুও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যশ ইন্দ্রের থেকে কোন অংশে কম ছিল না। তার কারণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্ত, এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের সমকক্ষ হয়েছিলেন, যদিও তিনি কেবল তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, আর ইন্দ্র সেখানে শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এটিই ভগবদ্ভক্তের বিশেষ সৌভাগ্য। ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী, কিন্তু ভক্ত অধিক মহিমান্বিত হন কেননা তিনি সর্বদাই শ্রেষ্ঠতমের সঙ্গে যুক্ত। সূর্যকিরণের বিতরণ সর্বত্র সমভাবে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কতকগুলি স্থান সর্বদাই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। তা সূর্যের জন্য হয় না, পক্ষান্তরে গ্রহণ করার ক্ষমতার ফলে হয়ে থাকে। তেমনই, যাঁরা সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত ভক্ত, তাঁরা ভগবানের পূর্ণ কৃপা লাভ করেন, যদিও তা সর্বত্রই সমভাবে বিতরিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ৭

আমন্ত্র্য পাণ্ডুপুত্রাংশ্চ শৈনেয়োদ্ধবসংযুতঃ ।
দ্বৈপায়নাদিভির্বিপ্রৈঃ পূজিতৈঃ প্রতিপূজিতঃ ॥ ৭ ॥

আমন্ত্র্য—নিমন্ত্রণ করে; **পাণ্ডুপুত্রান্**—সমস্ত পাণ্ডুপুত্রদের; **চ**—ও; **শৈনেয়**—সাত্যকি; **উদ্ধব**—উদ্ধব; **সংযুতঃ**—সহ; **দ্বৈপায়ন-আদিভিঃ**—বেদব্যাসপ্রমুখ ঋষিদের দ্বারা; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **পূজিতৈঃ**—পূজিত হয়ে; **প্রতিপূজিতঃ**—ভগবানও তাঁদের সেইভাবে পূজা করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেবপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পূজিত হয়ে তিনি সাত্যকি ও উদ্ধবসহ পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁদের দ্বারা পূজিত হয়ে ভগবানও তাঁদের প্রতি পূজা করলেন।

তাৎপর্য

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ক্ষত্রিয়, তাই তিনি ব্রাহ্মণদের পূজনীয় ছিলেন না। কিন্তু সেখানে উপস্থিত শ্রীল ব্যাসদেব প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা জানতেন যে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই তাঁরা তাঁর পূজা করেছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা যে ব্রাহ্মণদের অনুগত, সমাজ-ব্যবস্থার সেই নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য ভগবান তাঁদের প্রত্যভিবাদন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সমাজের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে সম্মান লাভ করেছিলেন, তথাপি তিনি কখনো সমাজের চতুরাশ্রম প্রথা লঙ্ঘন করেননি। ভগবান এই সমস্ত সামাজিক প্রথা পালন করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে অন্যেরা তাঁকে অনুসরণ করে।

শ্লোক ৮

গন্তুং কৃতমতির্ব্রহ্মন্ দ্বারকাং রথমাস্থিতঃ ।
উপলেভেঽভিধাবন্তীমুত্তরাং ভয়বিহ্বলাম্ ॥ ৮ ॥

গন্তুম্—গমনোদ্যত; **কৃতমতিঃ**—স্থির করে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **দ্বারকাম্**—দ্বারকা অভিমুখে; **রথম্**—রথে; **আস্থিতঃ**—আরোহণ করে; **উপলেভে**—দেখলেন; **অভিধাবন্তীম্**—দ্রুতবেগে আসতে; **উত্তরাম্**—উত্তরাকে; **ভয়বিহ্বলাম্**—ভয়ে ব্যাকুল হয়ে।

অনুবাদ

যে মুহূর্তে তিনি রথে আরোহণ করে গমনোদ্যত হয়েছেন, সেই সময় তিনি দেখলেন যে উত্তরা ভয়ে ব্যাকুলা হয়ে তাঁর দিকে দ্রুতবেগে আসছেন।

তাৎপর্য

পাণ্ডব পরিবারের সমস্ত সদস্যরাই তাঁদের নিজেদের রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, এবং তাই ভগবান সর্বাবস্থাতেই তাঁদের সকলকে রক্ষা করেছিলেন। ভগবান সকলকে রক্ষা করেন, কিন্তু কেউ যখন তাঁর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন তখন তিনি তাকে বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। পিতা তার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল তার সবচাইতে ছোট ছেলেটির প্রতি অধিক স্নেহশীল।

শ্লোক ৯

উত্তরোবাচ

পাহি পাহি মহাযোগিন্দেবদেব জগৎপতে।
নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃপরস্পরম্ ॥ ৯ ॥

উত্তরা উবাচ—উত্তরা বললেন; **পাহি পাহি**—আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন; **মহাযোগিন্**—হে যোগীশ্রেষ্ঠ; **দেব-দেব**—দেবতাদের দেবতা; **জগৎপতে**—হে জগদীশ্বর; **ন**—না; **অন্যম্**—অন্য কেউ; **ত্বৎ**—আপনি ছাড়া; **অভয়ম্**—ভয়রহিত; **পশ্যে**—আমি দেখি; **যত্র**—যেখানে; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **পরস্পরম্**—দ্বন্দ্বভাবসমন্বিত জগতে।

অনুবাদ

উত্তরা বললেন, হে দেবতাদের দেবতা, হে জগদীশ্বর, হে মহাযোগী! আমাকে রক্ষা করুন; কারণ দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত এই জগতে আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ অদ্বয়ভাব সমন্বিত চিজ্জগতের বিপরীত দ্বৈতভাব সমন্বিত। দ্বৈতভাব সমন্বিত এই জগৎ জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার দ্বারা গঠিত, কিন্তু চিজ্জগৎ

সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং সেখানে জড় গুণের লেশমাত্র নেই। দ্বৈত জগতে সকলেই ভ্রান্তিপূর্বক জগতের প্রভু হবার চেষ্টা করছে, কিন্তু চিজ্জগতে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম প্রভু, এবং অন্য সকলেই তাঁর ভৃত্য। দ্বৈতভাব সমন্বিত জড় জগতে সকলেই অন্যদের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ, এবং জড় ও চেতনের দ্বৈত অস্তিত্বের ফলে মৃত্যু সেখানে অনিবার্য। শরণাগত জীবদের জন্য ভগবানই একমাত্র অভয়প্রদ আশ্রয়। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত এই জড় জগতে কেউই মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

শ্লোক ১০

অভিদ্রবতি মামীশ শরস্তপ্তায়সো বিভো।
কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভো নিপাত্যতাম্ ॥ ১০ ॥

অভিদ্রবতি—অভিমুখে ধাবমান; **মাম্**—আমার; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর; **শরঃ**—বাণ; **তপ্ত**—জ্বলন্ত; **অয়সঃ**—লৌহ; **বিভো**—হে মহান; **কামম্**—বাসনা; **দহতু**—দগ্ধ করুক; **মাম্**—আমাকে; **নাথ**—হে রক্ষাকর্তা; **মা**—না; **মে**—আমার; **গর্ভঃ**—গর্ভস্থ সন্তান; **নিপাত্যতাম্**—নষ্ট করে।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, আপনি সর্বশক্তিমান। একটি জ্বলন্ত লৌহবাণ আমার প্রতি দ্রুতগতিতে ধাবিত হচ্ছে। হে নাথ, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে এটি আমাকে দগ্ধ করুক, কিন্তু এটি যেন আমার গর্ভস্থ সন্তানটিকে দগ্ধ না করে। হে পরমেশ্বর, আমাকে এই কৃপা করুন।

তাৎপর্য

এই ঘটনাটি ঘটেছিল উত্তরার পতি অভিমন্যুর মৃত্যুর পর। অভিমন্যুর বিধবা পত্নী উত্তরা, তাঁর পতির সহগমন করতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন, এবং ভগবানের এক মহান ভক্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর গর্ভে অবস্থান করছিলেন, তাই তাঁকে রক্ষা করা ছিল তাঁর একান্ত কর্তব্য। মাতার এক মহান দায়িত্ব হচ্ছে তার শিশু-সন্তানকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা, এবং তাই সেই কথা শ্রীকৃষ্ণের কাছে সরলভাবে ব্যক্ত করতে তিনি লজ্জা অনুভব করেননি। উত্তরা ছিলেন এক মহান রাজার কন্যা, এক মহান রাজার পত্নী, এক মহান ভক্তের শিষ্যা, এবং পরবর্তীকালে তিনি একজন মহান রাজার মাতাও হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে সৌভাগ্যশালিনী।

শ্লোক ১১

সূত উবাচ

উপধার্য বচস্তস্যা ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
অপাণ্ডবমিদং কর্তুং দ্রৌণেরস্ত্রমবুধ্যত ॥ ১১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **উপধার্য**—ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করে; **বচঃ**—কথা; **তস্যাঃ**—তাঁর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্ত-বৎসলঃ**—যিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ; **অপাণ্ডবম্**—পাণ্ডবদের বংশধরশূন্য; **ইদম্**—এই; **কর্তুম্**—করার জন্য; **দ্রৌণেঃ**—দ্রোণাচার্যের পুত্র; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **অবুধ্যত**—বুঝতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, তাঁর কথা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করে ভক্তবৎসল পরমেশ্বর ভগবান তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডব বংশের শেষ বংশধরটিকে বিনষ্ট করার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অনুরক্ত, কেননা সকলের কল্যাণের জন্য তা নিতান্তই আবশ্যক। পাণ্ডব পরিবার ছিল ভক্ত-পরিবার, এবং তাই ভগবান চেয়েছিলেন যে তারাই যেন পৃথিবী শাসন করে। সেই কারণে তিনি দুর্যোধনের গোষ্ঠীর শাসন সমাপ্ত করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। তাই, তিনি গর্ভস্থ মহারাজ পরীক্ষিতকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। পৃথিবী আদর্শ ভক্ত পরিবার পাণ্ডববিহীন হয়ে যাক্, তা তিনি চাননি।

শ্লোক ১২

তর্হ্যেবাথ মুনিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ সায়কান্।
আত্মনোঽভিমুখান্দীপ্তান্ আলক্ষ্যাস্ত্রাণ্যুপাদদুঃ ॥ ১২ ॥

তর্হি—তখন; **এব**—ও; **অথ**—অতএব; **মুনি-শ্রেষ্ঠ**—হে মুনিশ্রেষ্ঠ; **পাণ্ডবাঃ**—পাণ্ডবেরা; **পঞ্চ**—পাঁচ; **সায়কান্**—অস্ত্রশস্ত্র; **আত্মনঃ**—নিজেদের; **অভিমুখান্**—অভিমুখে; **দীপ্তান্**—জ্বলন্ত; **আলক্ষ্য**—দর্শন করে; **অস্ত্রাণি**—অস্ত্রশস্ত্র; **উপাদদুঃ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে মুনিশ্রেষ্ঠ (শৌনক), পাণ্ডবেরা তখন জ্বলন্ত ব্রহ্মাস্ত্র তাঁদের অভিমুখে আসতে দেখে তাঁদের পাঁচটি নিজ নিজ অস্ত্র তুলে নিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাস্ত্র পারমাণবিক অস্ত্রের থেকেও অধিক সূক্ষ্ম। মহারাজ যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পঞ্চপাণ্ডব এবং উত্তরার গর্ভস্থ তাঁদের একমাত্র পৌত্রকে হত্যা করার জন্য অশ্বত্থামা সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। তাই ব্রহ্মাস্ত্র পারমাণবিক অস্ত্রের থেকেও অধিক কার্যকরী এবং সূক্ষ্ম, কেননা ব্রহ্মাস্ত্র পারমাণবিক অস্ত্রের মতো অন্ধ নয়। যখন আণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়, তখন তা লক্ষ্যবস্তু এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। প্রধানত পারমাণবিক অস্ত্র নিরীহ ব্যক্তিদেরও অনিষ্ট সাধন করে, কেননা পার্থক্য নিরূপণ করার ক্ষমতা তার নেই। ব্রহ্মাস্ত্র কিন্তু তেমন নয়। সর্বপ্রথমে তা লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে এবং নিরীহ ব্যক্তিদের অনিষ্ট সাধন না করে সেই উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়।

শ্লোক ১৩

ব্যসনং বীক্ষ্য তত্তেষামনন্যবিষয়াত্মনাম্ ।
সুদর্শনেন স্বাস্ত্রেণ স্বানাং রক্ষাং ব্যধাদ্বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

ব্যসনম্—মহা বিপদ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তৎ**—তা; **তেষাম্**—তাঁদের; **অনন্য**—অন্য কিছু না; **বিষয়**—উপায়; **আত্মনাম্**—এই প্রকার প্রবণতাবিশিষ্ট; **সুদর্শনেন**—শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের দ্বারা; **স্ব-অস্ত্রেণ**—নিজ অস্ত্রের দ্বারা; **স্বানাম্**—তাঁর নিজের ভক্তদের; **রক্ষাম্**—রক্ষা; **ব্যধাৎ**—করেছিলেন; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত অনন্য ভক্তদের মহা বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তখন তিনি তাঁদের রক্ষা করার জন্য আপন অস্ত্র সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন।

তাৎপর্য

অশ্বত্থামা যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল তা অনেকটা পারমাণবিক অস্ত্রের মতো, তবে তা ছিল অধিক তেজ এবং তাপসম্পন্ন। এই ব্রহ্মাস্ত্র সূক্ষ্মতর বিজ্ঞানের অবদান, যা সূক্ষ্ম

শব্দতরঙ্গরূপ বৈদিক মন্ত্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই অস্ত্রের আরেকটি গুণ হচ্ছে যে তা পারমাণবিক অস্ত্রের মতো অন্ধ নয়, কেননা তা কেবল নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্যেই নিক্ষেপ করা যায় এবং তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অন্যদিকে গমন করে না। অশ্বত্থামা সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল কেবল পাণ্ডব পরিবারের পুরুষদের সংহার করার জন্য; তাই একদিক দিয়ে সেটি পারমাণবিক অস্ত্রের থেকেও ভয়ঙ্কর ছিল, কেননা তা সবচাইতে সুরক্ষিত স্থানেও প্রবেশ করতে পারতো এবং কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না। এই সমস্ত বিষয়ে অবগত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সেই সব ভক্তদের রক্ষা করার জন্য যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া অন্য কিছুই জানতেন না। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্পষ্টভাবে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাঁর ভক্তের কখনো বিনাশ হবে না; এবং তিনি তাঁর ভক্তের সেবার গুণ এবং মাত্রা অনুসারে আচরণ করেন। এখানে *অনন্য-বিষয়াত্মনাম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। পাণ্ডবেরা যদিও ছিলেন এক-একজন মহারথী, তথাপি তাঁরা ভগবানের সংরক্ষণের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। ভগবান সবচাইতে বড় বীরদেরও উপেক্ষা করে নিমেষের মধ্যে তাদের সংহার করতে পারেন। ভগবান যখন দেখলেন যে অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করার সময় পাণ্ডবদের নেই, তখন তিনি তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেও তাঁর অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। যদিও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, তথাপি, নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁর অস্ত্র ধারণ করা উচিত ছিল না। কিন্তু তখন সেই সঙ্কট তাঁর কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভগবান ভক্তবৎসল নামে পরিচিত, এবং তাই তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করার জাগতিক নীতিবোধের থেকে তাঁর ভক্তবাৎসল্যকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

অন্তঃস্থঃ সর্বভূতানামাত্মা যোগেশ্বরো হরিঃ ।
স্বমায়য়াবৃণোদ্‌গর্ভং বৈরাট্যাঃ কুরুতন্তবে ॥ ১৪ ॥

অন্তঃস্থঃ—অন্তরে; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতানাম্**—জীবদের; **আত্মা**—আত্মা; **যোগেশ্বরঃ**—সমস্ত যোগীদের ঈশ্বর; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে; **আবৃণোৎ**—আবৃত করেছিলেন; **গর্ভম্**—গর্ভ; **বৈরাট্যাঃ**—উত্তরার; **কুরুতন্তবে**—মহারাজ কুরুর বংশ রক্ষার জন্য।

অনুবাদ

পরম যোগ রহস্যের নিয়ন্তা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই কুরুবংশ রক্ষা করার জন্য তাঁর যোগমায়ার দ্বারা তিনি উত্তরার গর্ভ আবৃত করলেন।

তাৎপর্য

পরম যোগেশ্বর ভগবান তাঁর অংশ প্রকাশ পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এমনকি প্রতিটি পরমাণুর অভ্যন্তরেও অবস্থান করতে পারেন। তাই তিনি মহারাজ পাণ্ডুর পূর্বসূরী মহারাজ কুরুর বংশ রক্ষার জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন এবং তিনি উত্তরার দেহাভ্যন্তর থেকে তাঁর গর্ভ আবৃত করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু উভয়ের পুত্রবাই ছিলেন মহারাজ কুরুর বংশধর; তাই তাঁরা উভয়েই সাধারণত কৌরব নামে পরিচিত। কিন্তু যখন এই দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ হয়, তখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কৌরব নামে এবং পাণ্ডুর পুত্রেরা পাণ্ডব নামে পরিচিত হন। যেহেতু ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র এবং পৌত্রেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তাই সেই বংশের শেষ সন্তান কুরুতন্ত বা কুরুপুত্র নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

যদ্যপস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্ত্বমোঘং চাপ্রতিক্রিয়ম্ ।
বৈষ্ণবং তেজ আসাদ্য সমশাম্যদ্‌ভৃগূদ্বহ ॥ ১৫ ॥

যদ্যপি—যদিও; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **ব্রহ্ম-শিরঃ**—ব্রহ্মাস্ত্র; **তু**—কিন্তু; **অমোঘম্**—অব্যর্থ; **চ**—এবং; **অপ্রতিক্রিয়ম্**—অনিবার্য; **বৈষ্ণবম্**—বিষ্ণুসম্বন্ধীয়; **তেজঃ**—শক্তি; **আসাদ্য**—প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে; **সমশাম্যৎ**—নিষ্ক্রিয় হয়েছিল; **ভৃগু-উদ্বহ**—হে ভৃগু বংশের গৌরব।

অনুবাদ

হে শৌনক, যদিও অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র ছিল অব্যর্থ এবং অনিবার্য, তথাপি শ্রীবিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) তেজের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় এবং ব্যর্থ হল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্মজ্যোতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর আশ্রিত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে ব্রহ্মতেজ নামক জ্যোতি ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ছাড়া আর কিছু নয়, ঠিক যেমন সূর্যকিরণ হচ্ছে সূর্যমণ্ডলের রশ্মিচ্ছটা। তাই এই ব্রহ্মাস্ত্র, জড় বিচারে অপ্রতিরুদ্ধ হলেও, পরমেশ্বর ভগবানের পরম শক্তি অতিক্রম করতে অক্ষম ছিল। অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় শক্তির দ্বারা প্রতিহত হয়েছিল; অর্থাৎ, তাঁকে অন্য কারও সাহায্যের অপেক্ষা করতে হয়নি, কেননা তিনি হচ্ছেন পরম তত্ত্ব।

শ্লোক ১৬

মা মংস্থা হ্যেতদাশ্চর্যং সর্বাশ্চর্যময়েঽচ্যুতে।
য ইদং মায়য়া দেব্যা সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥ ১৬ ॥

মা—কর না; মংস্থা—চিন্তা; হি—অবশ্যই; এতৎ—এই সমস্ত; আশ্চর্যম্—অদ্ভুত; সর্ব—সমস্ত; আশ্চর্য-ময়ে—অতি অদ্ভুত লীলাময়ে; অচ্যুতে—শ্রীকৃষ্ণে; যঃ—যিনি; ইদম্—এই জগতে; মায়য়া—তাঁর শক্তির দ্বারা; দেব্যা—দিব্য; সৃজতি—সৃষ্টি করেন; অবতি—পালন করেন; হন্তি—সংহার করেন; অজঃ—প্রাকৃত জন্মরহিত।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, যে আশ্চর্যময় ও অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা এই জড় জগতের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন, এবং যিনি প্রাকৃত জন্মরহিত, তাঁর পক্ষে এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রশমন-কার্য বিশেষ বিস্ময়কর বলে মনে করবেন না।

তাৎপর্য

ভগবানের কার্যকলাপ সর্বদাই জীবের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কাছে অচিন্ত্য। পরমেশ্বর ভগবানের কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ আশ্চর্যজনক, এবং তাই তিনি সর্বদাই আমাদের চিন্তার অতীত। ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, পরম পূর্ণ পরমেশ্বর। ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ, কিন্তু অন্য সকলে, যথা নারায়ণ, ব্রহ্মা, শিব, দেবতাগণ এবং অন্য সমস্ত জীব, বিভিন্ন মাত্রায় তাঁর পূর্ণতার কেবল কিঞ্চিৎ অংশের অধিকারী। কেউই তাঁর সমকক্ষ নন অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নন। তিনি অদ্বিতীয়।

শ্লোক ১৭

ব্রহ্মতেজোবিনির্মুক্তৈরাত্মজৈঃ সহ কৃষ্ণয়া ।
প্রয়াণাভিমুখং কৃষ্ণমিদমাহ পৃথা সতী ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্ম-তেজঃ—ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ; **বিনির্মুক্তৈঃ**—রক্ষা লাভ করে; **আত্ম-জৈঃ**—তাঁর পুত্রগণ; **সহ**—সহ; **কৃষ্ণয়া**—দ্রৌপদী; **প্রয়াণ**—প্রস্থান; **অভিমুখম্**—অভিমুখে; **কৃষ্ণম্**—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে; **ইদম্**—এই; **আহ**—বললেন; **পৃথা**—কুন্তী; **সতী**—ভগবানের অনুরক্তা সাধ্বী।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণভক্ত সাধ্বী কুন্তী তাঁর পঞ্চপুত্র এবং দ্রৌপদীসহ একযোগে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকার অভিমুখে গমনোদ্যত হলেন।

তাৎপর্য

এখানে কুন্তীদেবীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অনন্য ভক্তির জন্য সতী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন, ভগবানের প্রতি তাঁর নিম্নলিখিত প্রার্থনাটিতে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হবে। ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত, বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের জন্যও অন্য কোন জীব অথবা দেবতার মুখাপেক্ষী হন না। সমস্ত পাণ্ডব পরিবারের মধ্যেই এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি সব সময় দেখা গেছে। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া অন্য কিছুই জানতেন না, এবং তাই ভগবানও সর্বদাই সর্ব অবস্থায় সর্বতোভাবে তাঁদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। সেটিই ভগবানের দিব্য স্বভাব। তিনি ভক্তের নির্ভরতার প্রতিদান দেন। তাই অপূর্ণ জীব অথবা দেবতাদের সাহায্য প্রার্থনা না করে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই সাহায্য প্রত্যাশা করা উচিত, যিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। এই প্রকার শুদ্ধভক্তও কখনো ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করেন না, কিন্তু ভগবান স্বেচ্ছায় তাঁদের সহায়তা করার জন্য সর্বদা উৎসুক থাকেন।

শ্লোক ১৮

কুন্ত্যুবাচ

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
অলক্ষ্যং সর্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

কুন্ত্যুবাচ—শ্রীমতী কুন্তীদেবী বললেন; **নমস্যে**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **পুরুষম্**—পরম পুরুষকে; **ত্বা**—তুমি; **আদ্যম্**—আদি; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পরম্**—অতীত; **অলক্ষ্যম্**—অদৃশ্য; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতানাম্**—জীবদের; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **অবস্থিতম্**—বিরাজমান।

অনুবাদ

শ্রীমতী কুন্তীদেবী বললেন, হে কৃষ্ণ, আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কারণ তুমি আদি পুরুষ এবং জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত। তুমি সকলের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, তথাপি তোমাকে কেউ দেখতে পায় না।

তাৎপর্য

শ্রীমতী কুন্তীদেবী ভালভাবেই জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে লীলাবিলাস করছেন, তথাপি তিনি হচ্ছেন আদি পুরুষ ভগবান। এই প্রকার জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত রমণী কখনো তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রণাম করে ভুল করতে পারেন না। তাই, তিনি তাঁকে প্রকৃতির অতীত *আদি পুরুষ* বলে সম্বোধন করেছেন। যদিও জীবেরাও প্রকৃতির অতীত, কিন্তু তারা আদি পুরুষ বা অচ্যুত নয়। জীবেরা জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অধঃপতিত হতে পারে, কিন্তু ভগবান কখনোই তেমন নন। তাই বেদে তাঁকে সমস্ত জীবের মধ্যে প্রধান বলে বর্ণনা করা হয়েছে *(নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্)*। তারপর তাঁকে আবার ঈশ্বর বা পরম নিয়ন্তা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। জীবেরা অথবা চন্দ্র, সূর্য আদি দেবতারাও কিছু পরিমাণে *ঈশ্বর*, কিন্তু তাদের কেউই *পরমেশ্বর* বা পরম নিয়ন্তা নন। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর বা পরমাত্মা। তিনি অন্তরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই বিরাজমান। যদিও তিনি শ্রীমতী কুন্তীদেবীর সম্মুখে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে উপস্থিত ছিলেন, একই সঙ্গে তিনি তাঁর অন্তরে এবং অন্য সকলের অন্তরে বিরাজমান ছিলেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছি, এবং কেবল আমারই প্রভাবে স্মৃতি, বিস্মৃতি এবং জ্ঞান ইত্যাদির প্রকাশ হয়। সমস্ত বেদের মাধ্যমে আমাকে জানা যায়, কেননা আমিই হচ্ছি বেদের প্রণেতা, এবং বেদান্তবেত্তা।" কুন্তীদেবী প্রতিপন্ন করেছেন যে ভগবান যদিও সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাইরে রয়েছেন, তথাপি তিনি অদৃশ্য। তাই বলা যায় যে ভগবান সাধারণ মানুষের কাছে একটি ধাঁধার মতো। কুন্তীদেবী ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, তথাপি তিনি উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের আক্রমণ থেকে তাঁর ভ্রূণ রক্ষা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপ্ত না একস্থানে

স্থিত, সে কথা ভেবে কুন্তীদেবী নিজেও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি উভয়ই, কিন্তু যারা তাঁর শরণাগত নয় তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করার অধিকার তিনি বজায় রাখেন। এইভাবে তাঁকে আচ্ছাদিত করে রাখে যে যবনিকা, তাকে ভগবানের *মায়াশক্তি* বলা হয়, এবং এটি বিদ্রোহী আত্মাদের সীমিত দৃষ্টিশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তা নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৯

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্ ।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥ ১৯ ॥

মায়া—মোহজনক; জবনিকা—পর্দা; আচ্ছন্নম্—আবৃত; অজ্ঞা—অজ্ঞ; অধোক্ষজম্—জড় ইন্দ্রিয় উপলব্ধির অতীত; অব্যয়ম্—অব্যক্ত; ন—না; লক্ষ্যসে—দেখা; মূঢ়দৃশা—মূঢ় দ্রষ্টা; নটঃ—অভিনেতা; নাট্যধরঃ—অভিনেতার সাজে সজ্জিত; যথা—যেমন।

অনুবাদ

তুমি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত, তুমি মায়ারূপা যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত, অব্যক্ত ও অচ্যুত। মূঢ়দ্রষ্টা যেমন অভিনেতার সাজে সজ্জিত শিল্পীকে দেখে সাধারণত চিনতে পারে না, তেমনই অজ্ঞ ব্যক্তিরা তোমাকে দেখতে পায় না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন যে মূঢ় ব্যক্তিরা তাঁকে আমাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁকে উপহাস করে। এখানে কুন্তীদেবীও সেই কথাই বলেছেন। মূর্খ মানুষ হচ্ছে তারা যারা ভগবানের প্রভুত্বের প্রতি বিদ্রোহ করে। এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয় অসুর। অসুরেরা ভগবানের কর্তৃত্ব মানতে চায় না। ভগবান স্বয়ং যখন আমাদের সম্মুখে রাম, নৃসিংহ, বরাহ অথবা তাঁর কৃষ্ণ স্বরূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি বহু আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করেন যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই মহান গ্রন্থের দশম স্কন্ধে আমরা দেখতে পাব যে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর মায়ের কোলে ছিলেন তখন থেকেই তিনি মানুষের পক্ষে অসম্ভব সমস্ত কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছিলেন। পুতনা রাক্ষসী যদিও তার স্তনে বিষ মাখিয়ে ভগবানকে হত্যা করতে এসেছিলেন, কিন্তু সেই পুতনাকে তিনি সংহার করেছিলেন।

একটি সাধারণ শিশুর মতো তিনি তার স্তন পান করার মাধ্যমে তার প্রাণবায়ু শুষে নিয়েছিলেন। তেমনই, একটি বালক যেমন অনায়াসে একটি ব্যাঙের ছাতা তুলে ধরে, ঠিক সেইভাবে তিনি গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলেন, এবং বৃন্দাবনের অধিবাসীদের রক্ষা করার জন্য তিনি কয়েকদিন ধরে সেটি সেইভাবে ধারণ করেছিলেন। এইগুলি পুরাণ, ইতিহাস, উপনিষদ আদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবানের অলৌকিক কার্যকলাপের কয়েকটি বর্ণনা। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে তিনি তাঁর অলৌকিক উপদেশ প্রদান করেছেন। তিনি একজন যোদ্ধারূপে, গৃহস্থরূপে, শিক্ষকরূপে, ত্যাগীরূপে তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। ব্যাস, দেবল, অসিত, নারদ, মধ্ব, শংকর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীজীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী এবং এই ধারায় সমস্ত মহাজনগণ কর্তৃক তিনি পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকৃত হয়েছেন। তিনি নিজেও প্রামাণিক শাস্ত্রের বহু জায়গায় সে কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একশ্রেণীর আসুরিক মনোভাবাপন্ন মানুষ রয়েছে, যারা সর্বদাই ভগবানকে পরম সত্য বলে স্বীকার না করতে বদ্ধপরিকর। তার একটি কারণ হচ্ছে তাদের জ্ঞানের অভাব এবং অন্য কারণটি হচ্ছে তাদের পূর্বকৃত ও বর্তমান দুষ্কর্মের ফলস্বরূপ অদম্য জেদ। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাদের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন তখনও তারা তাঁকে ভগবান বলে চিনতে পারে নি। আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে যে যারা তাদের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের উপর অধিক নির্ভরশীল তারা কখনোই তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে পারে না। এই প্রকার মানুষেরা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতো। তারা সবকিছু তাদের গবেষণাভিত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে চায়। কিন্তু ভ্রান্ত গবেষণালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানা কখনোই সম্ভব নয়। তাঁকে এখানে অধোক্ষজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ, তিনি ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অতীত। আমাদের সবকটি ইন্দ্রিয়ই ভ্রান্ত। আমরা সবকিছু দেখার দাবি করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের এই দর্শন কতকগুলি জাগতিক অবস্থার অধীন, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত। বদ্ধ জীবদের, বিশেষ করে একজন অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন স্ত্রীলোকের এই অক্ষমতা কুন্তীদেবী স্বীকার করেছেন। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য তাই মন্দির, মসজিদ অথবা গির্জার অবশ্য প্রয়োজন, যাতে তারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে এবং এই প্রকার পবিত্র স্থানে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করতে পারে। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য, পারমার্থিক জীবনের শুরুতে এটি অত্যন্ত আবশ্যক। মূর্খ মানুষেরাই কেবল ভগবানের আরাধনার এই সমস্ত স্থানগুলি প্রতিষ্ঠা করার বিরোধিতা করে, যেগুলি জনসাধারণের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের

জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। উন্নত ভক্তের পক্ষে সক্রিয় সেবার মাধ্যমে তাঁর ধ্যান করার মতোই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে মন্দির, মসজিদ অথবা গীর্জায় ভগবানের সম্মুখে ভগবানের প্রভুত্ব স্বীকার করে মস্তক অবনত করা সমান মঙ্গলজনক।

শ্লোক ২০

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্ ।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥

তথা—তা ছাড়া; **পরমহংসানাম্**—উন্নত পরমার্থবাদীদের; **মুনীনাম্**—মহান দার্শনিক অথবা মনোধর্মীদের; **অমলাত্মনাম্**—জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণে অভিজ্ঞদের; **ভক্তিযোগ**—ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান; **বিধান-অর্থম্**—সম্পাদন করার জন্য; **কথম্**—কিভাবে; **পশ্যেম**—দর্শন করতে পারবো; **হি**—অবশ্যই; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীলোকেরা।

অনুবাদ

পরমার্থের পথে উন্নত পরমহংসদের, মুনিদের এবং জড় ও চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে যাঁদের অন্তর নির্মল হয়েছে, তাঁদের অন্তরে অপ্রাকৃত ভক্তিযোগ-বিজ্ঞান বিকশিত করার জন্য তুমি স্বয়ং অবতরণ কর। তাহলে আমার মতো স্ত্রীলোকেরা কিভাবে তোমাকে সম্যক্‌রূপে জানতে পারবে।

তাৎপর্য

সর্বশ্রেষ্ঠ মনোধর্মী দার্শনিকেরাও ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে পারে না। উপনিষদে বলা হয়েছে যে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদেরও চিন্তার অতীত। মহান বিদ্যা অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের দ্বারাও তাঁকে জানা যায় না। যিনি তাঁর কৃপা লাভ করেছেন, কেবল তিনিই তাঁকে জানতে পারেন। অন্যেরা বছরের পর বছর ধরে তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে, তথাপি তিনি তাদের কাছে অজ্ঞাতই থাকেন। মহারাণী কুন্তীদেবী সেই সত্য দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন, যিনি এখানে একজন সরলা নারীর ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। স্ত্রীলোকেরা সাধারণত দার্শনিকদের মতো চিন্তা করতে পারেন না, কিন্তু তাঁরা ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছেন, কেননা তাঁরা সহজেই ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বশক্তিমত্তা স্বীকার করেন, এবং তার ফলে তাঁরা নিঃসঙ্কোচে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেন। ভগবান এতই কৃপাময় যে তিনি কেবল মহান দার্শনিকদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন না। তিনি সকলের

ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে অবগত। তাই যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাধারণত অধিক সংখ্যায় স্ত্রীলোকদের সমবেত হতে দেখা যায়। প্রতিটি দেশে এবং প্রতিটি ধর্ম সম্প্রদায়ে পুরুষদের থেকে স্ত্রীদের অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করতে দেখা যায়। ভগবানের প্রতি এই সরল বিশ্বাস নিষ্ঠারহিত লোক দেখানো ধর্মপরায়ণতা থেকে অনেক বেশি কার্যকরী।

শ্লোক ২১

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণায়—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **বাসুদেবায়**—বসুদেব তনয়কে; **দেবকীনন্দনায়**—দেবকীপুত্রকে; **চ**—এবং; **নন্দগোপকুমারায়**—গোপরাজ নন্দের তনয়কে; **গোবিন্দায়**—গাভী এবং ইন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধানকারী শ্রীগোবিন্দকে; **নমঃ নমঃ**—বার বার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

বসুদেবতনয়, দেবকীনন্দন, গোপরাজ নন্দের পুত্র এবং গাভী ও ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দদাতা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি বার বার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জড় প্রচেষ্টার দ্বারা কখনো ভগবানকে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁর অসীম এবং অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর অনন্য ভক্তদের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য এবং আসুরিক ব্যক্তিদের উপদ্রব দমন করার জন্য তিনি তাঁর স্বরূপে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। কুন্তীদেবী অন্য সমস্ত অবতারদের থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের বিশেষ বন্দনা করেছেন, কেননা এই অবতারে তিনি সহজলভ্য। তাঁর রাম অবতারে তিনি তাঁর শৈশব থেকেই রাজপুত্র ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণরূপে যদিও তিনি একজন রাজার পুত্র, তথাপি তিনি তাঁর প্রকৃত পিতামাতার (মহারাজ বসুদেব এবং মহারাণী দেবকী) আশ্রয় ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের ঠিক পরেই তিনি পবিত্র বৃন্দাবনে একজন সাধারণ গোপবালকের মতো লীলাবিলাস করার জন্য যশোদা মায়ের কোলে গিয়েছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামচন্দ্রের থেকে অধিক কৃপালু। তিনি নিঃসন্দেহে কুন্তীর ভ্রাতা বসুদেব ও তাঁর পরিবারের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু ছিলেন।

তিনি যদি বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত না হতেন, তাহলে কুন্তীদেবী তাঁকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলে দাবি করে বিশেষ বাৎসল্য স্নেহে তাঁকে এইভাবে সম্বোধন করতে পারতেন না। কিন্তু নন্দ এবং যশোদা অধিক সৌভাগ্যশালী, কেননা তাঁরা ভগবানের বাল্যলীলা আস্বাদন করেছিলেন, যা তাঁর অন্যান্য সমস্ত লীলাবিলাস থেকে অধিক আকর্ষণীয়। ব্রজভূমিতে তিনি যে তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করেছিলেন তা অতুলনীয়, কেননা তা *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণিত চিন্তামণিধাম স্বরূপ মূল কৃষ্ণলোকে অনুষ্ঠিত তাঁর নিত্যলীলার প্রতিরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপ্রাকৃত পার্ষদ এবং উপকরণসহ ব্রজভূমিতে অবতরণ করেছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে ব্রজবাসীদের মতো ভাগ্যবান আর কেউ নেই; বিশেষ করে ব্রজবালিকারা, যাঁরা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন। নন্দ-যশোদা, গোপ এবং বিশেষ করে গোপবালক এবং গাভীদের সঙ্গে তাঁর লীলাবিলাসের ফলে তিনি গোবিন্দ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। গোবিন্দরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের প্রতি অধিক অনুরক্ত এবং এর মাধ্যমে এটিই সূচিত হয় যে মানুষের সমৃদ্ধি এই দুটি বিষয়ের অর্থাৎ, ব্রহ্মণ্য-সংস্কৃতি এবং গো-রক্ষার উপর নির্ভর করে। যেখানে এই দুটি বিষয়ের অভাব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনো সেখানে প্রসন্ন হতে পারেন না।

শ্লোক ২২

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে ।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ২২ ॥

নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পঙ্কজনাভায়**—যাঁর উদরের কেন্দ্রে পদ্মসদৃশ বিশেষ আবর্তবিশিষ্ট নাভি আছে, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পঙ্কজমালিনে**—যাঁর গলদেশে সর্বদা পদ্মফুলের মালা শোভিত; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পঙ্কজনেত্রায়**—যাঁর দৃষ্টিপাত পদ্মফুলের মতো স্নিগ্ধ; **নমস্তে**—তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে**—যাঁর পদতল পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত (এবং তার ফলে তাঁকে বলা হয় চরণপদ্মধারী)।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, তোমার উদর-কেন্দ্রের নাভিদেশ পদ্মসদৃশ আবর্তে চিহ্নিত, গলদেশে পদ্মের মালা নিয়ত শোভিত, তোমার দৃষ্টিপাত পদ্মের মতো স্নিগ্ধ এবং পাদদ্বয় পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত, তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় শরীরে যে বিশেষ লক্ষণগুলি অন্য সকলের শরীর থেকে তাঁর শরীরের পার্থক্য নির্ণয় করে, তার কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। সেগুলি ভগবানের শরীরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভগবান আমাদের মতো প্রতীত হতে পারেন, কিন্তু তিনি সর্বদাই তাঁর শরীরের বিশেষ চিহ্নগুলির দ্বারা স্বতন্ত্র থাকেন। শ্রীমতী কুন্তীদেবী বলেছেন যে তিনি একজন নারী হওয়ার ফলে ভগবানের দর্শনের অযোগ্য। তিনি সে কথা বলেছেন কেননা স্ত্রী, শূদ্র (শ্রমিক শ্রেণী) এবং দ্বিজবন্ধু, বা উচ্চবর্ণের অযোগ্য বংশধর, এরা বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের চিন্ময় নাম, যশ, লক্ষণ, রূপ ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়ার অযোগ্য। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের চিন্ময় লীলাবিলাস অবগত হতে অক্ষম হলেও তাঁর অর্চা-বিগ্রহরূপে তাঁকে দর্শন করতে পারেন, যেইরূপে তিনি অধঃপতিত জীবদের, এমনকি উপরেলিখিত স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদেরও কৃপা করার জন্য এই জড় জগতে অবতরণ করেন। যেহেতু এই প্রকার অধঃপতিত জীবেরা জড়ের অতীত কোন কিছুই দর্শন করতে পারে না, তাই ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটিতে প্রবেশ করেন এবং সেখানে তাঁর অপ্রাকৃত নাভি থেকে উত্থিত একটি কমলে ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার জন্ম হয়। তাই ভগবান *পঙ্কজনাভি* নামে পরিচিত। ভগবান *পঙ্কজনাভি* প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান যথা মন, কাঠ, মাটি, ধাতু, রত্ন, রঙ, বালুকাপৃষ্ঠে অঙ্কিত চিত্র ইত্যাদির দ্বারা প্রকাশিত অর্চা-বিগ্রহের (অপ্রাকৃত) রূপ পরিগ্রহ করেন। ভগবানের এই সমস্ত রূপ সর্বদা পদ্মফুলের মালায় ভূষিত থাকেন, এবং জড় কার্যকলাপে সর্বদা যুক্ত অভক্তদের আকর্ষণ করার জন্য তাঁর মন্দিরের পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত এবং স্নিগ্ধ হওয়া উচিত। ধ্যানীরা তাদের মনের মধ্যে ভগবানের রূপের আরাধনা করেন। তাই ভগবান স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের প্রতিও কৃপাপরায়ণ হন যদি তারা মন্দিরে গিয়ে তাদের জন্য প্রকাশিত ভগবানের বিভিন্ন রূপের আরাধনা করেন। এইভাবে যাঁরা মন্দিরে যান তাঁরা সাধারণ পৌত্তলিক নন, যা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা অনেক সময় মনে করে থাকে। সমস্ত মহান আচার্যেরা সর্বত্র অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কৃপা করার জন্য এই প্রকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। যারা শূদ্র এবং স্ত্রী বা তার থেকেও নিম্নস্তরে রয়েছে, তাদের এমন ভান করা উচিত নয় যে তারা মন্দিরে ভগবানের পূজা করার স্তর অতিক্রম করেছে।

ভগবানের শ্রীবিগ্রহের দর্শন শুরু করতে হয় তাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে, তারপর ধীরে ধীরে তাঁর জানুদেশ, কটিদেশ, বক্ষদেশ এবং মুখমণ্ডল দর্শন করতে হয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন না করে তাঁর মুখমণ্ডল দর্শন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শ্রীমতী

কুন্তীদেবী, ভগবানের পিতৃষ্বসা হওয়ার ফলে, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে তাঁকে দর্শন করতে শুরু করেননি, কেননা তাহলে ভগবান হয়তো লজ্জা অনুভব করতেন। এইভাবে ভগবানকে অপ্রস্তুত না করার জন্য তিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের উপর থেকে, অর্থাৎ তাঁর কোমর থেকে তাঁকে দর্শন করতে শুরু করেছিলেন। এবং ধীরে ধীরে তাঁর ঊর্ধ্বভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর মুখমণ্ডলে এবং পরে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেছিলেন। গোলোকে সবকিছুই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অবস্থিত।

শ্লোক ২৩

যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী
কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা ।
বিমোচিতাহঞ্চ সহাত্মজা বিভো
ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্‌গণাৎ ॥ ২৩ ॥

যথা—যেমন; **হৃষীকেশ**—ইন্দ্রিয়াধিপতি; **খলেন**—ঈর্ষাপরায়ণ; **দেবকী**—দেবকী (শ্রীকৃষ্ণের জননী); **কংসেন**—অসুররাজ কংসের দ্বারা; **রুদ্ধা**—কারারুদ্ধ; **অতি-চিরম্**—দীর্ঘকাল; **শুচার্পিতা**—শোকাভিভূতা; **বিমোচিতা**—মুক্ত করেছিলেন; **অহম্ চ**—আমিও; **সহাত্মজা**—আমার সন্তানসহ; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **ত্বয়া এব**—তোমার দ্বারা; **নাথেন**—রক্ষাকর্তারূপে; **মুহুঃ**—সব সময়; **বিপদ্‌গণাৎ**—বিপদসমূহ থেকে।

অনুবাদ

হে হৃষীকেশ, সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ও সর্বেশ্বরেশ্বর, তোমার জননী দেবকীকে ঈর্ষাপরায়ণ কংস দীর্ঘকাল যাবৎ কারারুদ্ধ করে রাখাতে তিনি শোকে অভিভূত হলে তুমি তাঁকে কারামুক্ত করেছিলে, তেমনই তুমি আমাকে এবং আমার পুত্রদের বারে বারে বিপদরাশি থেকে মুক্ত করেছ।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের মাতা এবং কংসের ভগিনী দেবকীকে তাঁর স্বামী বসুদেবসহ কারাগারে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল, কেননা মাৎসর্যপরায়ণ রাজা কংসের ভয় ছিল যে দেবকীর অষ্টম পুত্র (কৃষ্ণ) তাকে বধ করবেন। কৃষ্ণের পূর্বে দেবকীর গর্ভজাত সবকটি পুত্রকে

কংস হত্যা করেছিল, কিন্তু কৃষ্ণ এই বিপদ এড়াতে পেরেছিলেন, কেননা তাঁকে তাঁর পালকপিতা নন্দমহারাজের গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কুন্তীদেবীও তাঁর পুত্রসহ ভয়ঙ্কর বিপদরাশি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীদেবীর প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন, কেননা যদিও তিনি দেবকীর অন্যান্য পুত্রদের রক্ষা করেননি, কিন্তু কুন্তীর পুত্রদের তিনি রক্ষা করেছিলেন। তিনি তা করেছিলেন কেননা দেবকীর পতি বসুদেব জীবিত ছিলেন, কিন্তু কুন্তীদেবী ছিলেন বিধবা এবং কৃষ্ণ ছাড়া তাঁকে সাহায্য করার আর কেউ ছিল না। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে যারা অধিক বিপদগ্রস্ত কৃষ্ণ তাদের অধিক অনুগ্রহ করেন। কখনো কখনো তিনি তাঁর শুদ্ধভক্তদের এইরকম বিপদে ফেলেন, কেননা সেই অসহায় ভক্ত ভগবানের প্রতি অধিক অনুরক্ত হন। ভক্ত ভগবানের প্রতি যত অনুরক্ত হন, তার সাফল্যও তত বেশি হয়।

শ্লোক ২৪

বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদদর্শনা-
দসৎসভায়া বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ ।
মৃধে মৃধেঽনেকমহারথাস্ত্রতো
দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ ॥ ২৪ ॥

বিষাৎ—বিষ থেকে; **মহাগ্নেঃ**—মহাগ্নি থেকে; **পুরুষাদ**—নরখাদক; **দর্শনাৎ**—সম্মুখীন হয়ে; **অসৎ**—পাপ চক্রান্তময়; **সভায়াঃ**—সভায়; **বন-বাস**—বনবাস; **কৃচ্ছ্রতঃ**—দুঃখ-কষ্ট; **মৃধে মৃধে**—বারংবার সংগ্রামে; **অনেক**—বহু; **মহা-রথ**—মহারথী; **অস্ত্রতঃ**—অস্ত্রশস্ত্র; **দ্রৌণি**—দ্রোণাচার্যের পুত্র; **অস্ত্রতঃ**—অস্ত্রশস্ত্র থেকে; **চ**—এবং; **আস্ম**—অতীতে; **হরে**—হে পরমেশ্বর হরি; **অভিরক্ষিতাঃ**—পূর্ণরূপে রক্ষা করেছিলে।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, পরমেশ্বর শ্রীহরি! বিষ, মহা অগ্নি, নরখাদক রাক্ষস, পাপচক্রান্তময় সভা, বনবাসের দুঃখ-কষ্ট থেকে, এবং যুদ্ধে বহু মহারথীর প্রাণঘাতী অস্ত্রসমূহ থেকে তুমি আমাদের পরিত্রাণ করেছ। আর এখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করলে।

মচ্ছাসনোদ্বৃত্তম্—প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর অসুর পিতার আদেশ অমান্য করেছিলেন। *যমক্ষয়ম্*—প্রতিটি বদ্ধ জীবই যমরাজের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু হিরণ্যকশিপু বলেছিলেন যে, তিনি প্রহ্লাদ মহারাজকে তার মুক্তিদাতা বলে মনে করেন, কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার করবেন। কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ একজন মহাভাগবত হওয়ার ফলে, যে কোন যোগীর থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি হিরণ্যকশিপুকে ভক্তিযোগীর সমাজে উন্নীত করবেন। এইভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সমস্ত শব্দগুলির অর্থ সরস্বতী দেবীর পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ৬

ক্রুদ্ধস্য যস্য কম্পন্তে ত্রয়ো লোকাঃ সহেশ্বরাঃ ।
তস্য মেঽভীতবন্মূঢ় শাসনং কিং বলোঽত্যগাঃ ॥ ৬ ॥

ক্রুদ্ধস্য—ক্রুদ্ধ হলে; **যস্য**—যে; **কম্পন্তে**—কম্পিত হয়; **ত্রয়ঃ লোকাঃ**—ত্রিভুবন; **সহ-ঈশ্বরাঃ**—তাদের নেতাগণ সহ; **তস্য**—তার; **মে**—আমার (হিরণ্যকশিপু); **অভীতবৎ**—নির্ভয়; **মূঢ়**—দুষ্ট; **শাসনম্**—শাসন; **কিম্**—কি; **বলঃ**—বল; **অত্যগাঃ**—অতিক্রম করেছিস।

অনুবাদ

ওরে মূঢ় প্রহ্লাদ, তুই জানিস যে আমি ক্রুদ্ধ হলে লোকপালগণ সহ ত্রিভুবন কম্পিত হয়। কিন্তু তুই কার বলে ভয়শূন্য হয়ে আমার শাসন অতিক্রম করছিস?

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। ভক্ত কখনও নিজেকে বলবান বলে দাবি করেন না, পক্ষান্তরে তিনি সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, এবং তিনি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে সমস্ত বিপদে রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩১) বলেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে কৌন্তেয়, তুমি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" ভগবান সেই কথা নিজে ঘোষণা না করে অর্জুনকে ঘোষণা করতে বলেছিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন এবং তাই মানুষ তাঁর কথায় বিশ্বাস নাও করতে পারে।

করলেই আমাদের আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে না বা এই সংসার চক্র দর্শন করতে হবে না।

তাৎপর্য

সাধারণত আর্ত, অর্থার্থী, জ্ঞানী এবং জিজ্ঞাসু, যাঁরা পুণ্যকর্ম করেছেন, তাঁরা ভগবানের আরাধনা করতে শুরু করেন। আর অন্য যারা দুষ্কর্মে লিপ্ত, তারা তাদের অবস্থা নির্বিশেষে মায়া কর্তৃক বিভ্রান্ত হওয়ার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারে না। পুণ্যবান ব্যক্তিরা যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হন, তখন তাঁদের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন গতি থাকে না। নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া। তাই তাঁরা তথাকথিত দুঃখ-দুর্দশাকে স্বাগত জানান, কেননা সেগুলি ভগবানকে স্মরণ করার সৌভাগ্য প্রদান করে, যার ফলে মুক্তি লাভ হয়। যিনি ভগবানের চরণকমলে শরণ গ্রহণ করেছেন, যা অবিদ্যার সাগর পার হওয়ার জন্য সবচাইতে উপযুক্ত নৌকার মতো, তিনি গোষ্পদ অতিক্রম করার মতো অতি সহজেই এই ভব সাগর পার হয়ে মুক্তি লাভ লাভ করেন। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবদ্ধামে বাস করার যোগ্য, এবং যে স্থানে প্রতি পদে বিপদ সে স্থানে তাঁদের থাকার কোন প্রয়োজন হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান এই জড় জগতকে এক ভয়ঙ্কর দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ স্থান বলে বর্ণনা করেছেন। মূর্খ মানুষেরা এই জগতকে চরম দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ একটি স্থান বলে না জেনে এখানকার দুঃখ-দুর্দশা নিরসন করার জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করে। দুঃখ-দুর্দশার স্পর্শ থেকে মুক্ত ভগবানের আনন্দময় ধাম সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষদের তাই কর্তব্য হচ্ছে এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশায় অবিচলিত থাকা, কেননা সমস্ত পরিস্থিতিতেই এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা অবশ্যম্ভাবী। সব রকম দুর্ভাগ্য ভোগ করে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে উন্নতি সাধনে চেষ্টা করা উচিত, কেননা সেটিই হচ্ছে মানব জীবনের উদ্দেশ্য। চিন্ময় আত্মা সব রকম জড় দুঃখ-দুর্দশার অতীত; তাই তথাকথিত দুঃখ-দুর্দশাকেও বলা হয় মিথ্যা। মানুষ স্বপ্নে দেখতে পারে যে একটি বাঘ এসে তাকে খাচ্ছে, এবং সেই বিপদের সময় সে ভয়ে আর্তনাদ করতে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোন বাঘ নেই এবং ব্যথা-বেদনাও নেই; এটি কেবল একটি স্বপ্ন। তেমনই জীবনের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাগুলিকে স্বপ্নও বলা হয়। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাহলে

সেটিকে চরম লাভ বলে মনে করা হয়। নববিধা ভক্ত্যাঙ্গের যে কোন একটি অঙ্গের দ্বারা ভগবানের সাথে সংযুক্ত হওয়া ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে সর্বদাই এক অগ্রগামী পদক্ষেপ।

শ্লোক ২৬

জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্ ।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥ ২৬ ॥

জন্ম—জন্ম; **ঐশ্বর্য**—বৈভব; **শ্রুত**—উচ্চ শিক্ষা; **শ্রীভিঃ**—সৌন্দর্যের দ্বারা; **এধমান**—ক্রমবর্ধমান; **মদঃ**—অহঙ্কার; **পুমান্**—মানুষের; **ন**—না; **এব**—কখনো; **অর্হতি**—সমর্থ হয়; **অভিধাতুম্**—অনুভূতি বা ভাব সহকারে সম্বোধন করা; **বৈ**—অবশ্যই; **ত্বাম্**—তোমাকে; **অকিঞ্চন-গোচরম্**—যিনি জড় অভিমানশূন্য ব্যক্তিদের অনায়াসে গোচরীভূত হন।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, যারা জড় আসক্তিশূন্য হয়েছে, তুমি সহজেই তাদের গোচরীভূত হও। আর যে ব্যক্তি জড়জাগতিক প্রগতিপন্থী এবং সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্য, উচ্চ শিক্ষা, দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে আপন উন্নতি লাভে সচেষ্ট, সে ঐকান্তিক ভাব সহকারে তোমার কাছে আসতে পারে না।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক উন্নতির অর্থই হল কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ, প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ, উচ্চশিক্ষা অর্জন এবং আকর্ষণীয় দৈহিক সৌন্দর্য লাভ। এই সমস্ত পার্থিব সম্পদ লাভ করার জন্য প্রতিটি জড়বাদী মানুষই উন্মত্তপ্রায়, এবং একেই বলা হয় জাগতিক সভ্যতার প্রগতি। কিন্তু এই সমস্ত পার্থিব সম্পদ লাভ করার ফলে মানুষ বৃথাই গর্বস্ফীত হয়ে ওঠে, অস্থায়ী সেই ধনমদে মত্ত হয়ে ওঠে। এই সমস্ত গর্বস্ফীত জড়বাদী মানুষেরা ঐকান্তিকভাবে 'হে গোবিন্দ', 'হে কৃষ্ণ' বলে তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে অসমর্থ হয়ে ওঠে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, একবার মাত্র পরমেশ্বর ভগবানের নাম উচ্চারণ করার ফলে পাপীর এত পাপ দূরীভূত হয় যে তত পাপ সে করতেই পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নামের এমনই বল। এটি মোটেই অত্যুক্তি নয়। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম এমনই শক্তি সমন্বিত।

কিন্তু এই নাম কীর্তন করতে হলে বিশেষ একটি যোগ্যতার প্রয়োজন, তা নির্ভর করে অন্তরের ভাব বা অনুভূতির মাত্রার উপর। একজন অসহায় মানুষ যতখানি গভীর অনুভূতি সহকারে ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণ করতে পারে, জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে পরিতৃপ্ত ব্যক্তি ততটা ঐকান্তিকতা সহকারে সেই নাম গ্রহণ করতে পারে না। অহঙ্কারে মত্ত ব্যক্তি কখনো কখনো ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে পারে, কিন্তু উৎকর্ষতা সহকারে তারা সেই নাম গ্রহণ করতে পারে না। তাই ১) উচ্চকুলে জন্ম, ২) ধন-সম্পদ, ৩) উচ্চশিক্ষা এবং ৪) দৈহিক সৌন্দর্য,—জড় উন্নতির এই চারটি অঙ্গ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে বাধাস্বরূপ।

শুদ্ধ আত্মার জড় আবরণটি বাহ্যিক, ঠিক যেমন জ্বর হচ্ছে অসুস্থ শরীরের একটি বাহ্যিক লক্ষণ। যখন কারও জ্বর হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই জ্বরের মাত্রা কমানোর চেষ্টা করা হয়, এবং কেউই ভুলভাবে চিকিৎসা করে তা বাড়াতে চায় না। কখনো কখনো দেখা যায় যে পারমার্থিক দৃষ্টিতে উন্নত ব্যক্তি জড়জাগতিক বিচারে দরিদ্র হয়ে যান। সেজন্য নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, এই প্রকার দারিদ্র্য শুভ লক্ষণ, ঠিক যেমন জ্বর কমে যাওয়া একটি অনুকূল লক্ষণ। জড় অহঙ্কার বা উন্মত্ততা হ্রাস করাই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কেননা এই ধরনের অহঙ্কারের ফলে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে তাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। যে সমস্ত ব্যক্তি গভীরভাবে মোহাচ্ছন্ন, তারা ভগবানের ধামে প্রবেশ করার অযোগ্য।

শ্লোক ২৭

নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে ।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥ ২৭ ॥

নমঃ—তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **অকিঞ্চন-বিত্তায়**—যিনি জড় বিষয়ে নিঃস্ব ব্যক্তিদের বা অকিঞ্চনগণের সম্পদ; **নিবৃত্ত**—সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; **গুণ**—প্রকৃতির গুণ; **বৃত্তয়ে**—প্রভাব; **আত্মারামায়**—যিনি পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত; **শান্তায়**—যিনি পূর্ণরূপে কামনা-বাসনা রহিত হয়ে প্রশান্ত ; **কৈবল্য-পতয়ে**—মুক্তিদানে সমর্থ; **নমঃ**—আমি নমস্কার করি।

অনুবাদ

জড় বিষয়ে যারা সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব, তুমি সেই অকিঞ্চনগণের সম্পদ। তুমি প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অতীত। তুমি সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত, এবং তাই তুমি

সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা রহিত হয়ে প্রশান্ত এবং মুক্তি দানে সমর্থ। আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জীবের কাছে যখন কোন কিছু না থাকে, তখন সে মনে করে যে তার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। তাই প্রকৃত অর্থে জীব কখনো ত্যাগী হতে পারে না। জীব অধিক মূল্যবান কোন কিছু প্রাপ্তির আশায় নিকৃষ্ট বস্তু ত্যাগ করে। একজন বিদ্যার্থী শিক্ষালাভের জন্য তার শিশুসুলভ চপলতা পরিত্যাগ করে। ভৃত্য ভাল চাকরীর আশায় তার চাকরী ত্যাগ করে। তেমনই একজন ভক্ত বিনা কারণে এই জড় জগৎ ত্যাগ করে না, সে তা করে আধ্যাত্মিক মূল্যায়ণের ভিত্তিতে প্রকৃত লাভের জন্য। শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং অন্যান্য অনেকে ভগবানের সেবার জন্য জাগতিক ঐশ্বর্য এবং সমৃদ্ধি ত্যাগ করেছিলেন। জাগতিক বিচারে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত বড়। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী ছিলেন বাংলার নবাবের মন্ত্রী, এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন তৎকালীন এক বিখ্যাত জমিদারের পুত্র। কিন্তু উচ্চতর কোন কিছু লাভের জন্য তাঁরা তাঁদের পূর্বের সমস্ত সম্পদ পরিত্যাগ করেছিলেন।

ভক্তেরা সাধারণত অকিঞ্চন, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাদের এক অত্যন্ত গুপ্ত কোষাগার রয়েছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সম্বন্ধে একটি খুব সুন্দর কাহিনী রয়েছে। তাঁর কাছে একটি পরশমণি ছিল, এবং তিনি সেই পরশমণিটি আবর্জনার একটি স্তূপের মধ্যে ফেলে রেখেছিলেন। এক দরিদ্র ব্যক্তি সেটি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরে সে ভাবতে শুরু করে কেন সেই মূল্যবান মণিটি একটি আবর্জনার স্তূপের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছিল। তখন সে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কাছে সবচাইতে মূল্যবান বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে এবং তিনি তাকে ভগবানের পবিত্র নাম দান করেন। *অকিঞ্চন* মানে হচ্ছে নির্ধন, অর্থাৎ যার কাছে দেওয়ার মতো জড়জাগতিক কিছুই নেই। প্রকৃত ভক্ত বা *মহাত্মা* কাউকে জড়জাগতিক কোন কিছু দান করেন না, কেননা তিনি সমস্ত জাগতিক ধন-সম্পদ ইতিমধ্যেই ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তিনি সবচাইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ পরমেশ্বর ভগবানকে দান করতে পারেন, কেননা ভগবান হচ্ছেন প্রকৃত ভক্তের একমাত্র সম্পত্তি। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পরশমণিটি, যা আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেটি তাঁর সম্পত্তি ছিল না; তা যদি হত তাহলে তিনি সেটি সেরকম একটি জায়গায় রাখতেন না। নবীন ভক্তদের জন্য এই বিশেষ দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে জাগতিক ভোগ-বাসনা এবং পারমার্থিক প্রগতি একাধারে সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি বস্তুকে চিন্ময়রূপে

ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত না দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্ময় এবং জড়ের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করা উচিত। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মতো সদ্‌গুরু যদিও ব্যক্তিগতভাবে সবকিছুই চিন্ময় দৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম, তথাপি আমাদের মতো চিন্ময়-দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের জন্য এই প্রকার উদাহরণ প্রদান করেন।

জড় দৃষ্টিভঙ্গি অথবা জড় সভ্যতার উন্নতি পারমার্থিক প্রগতির পথে একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। এই প্রকার জাগতিক উন্নতি জীবকে সবরকম দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় শরীরের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। এই প্রকার জড় উন্নতিকে বলা হয় *অনর্থ*, অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তুর কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে সেটি তাই। বর্তমান জড়-জাগতিক উন্নতির এই স্তরে মানুষ কুড়ি টাকা মূল্যের লিপ্‌স্টিক ব্যবহার করে, এবং এরকম অনেক অবাঞ্ছিত বস্তু রয়েছে যেগুলি দেহাত্ম-বুদ্ধি প্রসূত। এই প্রকার অবাঞ্ছিত বস্তুর দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে মানুষের শক্তির অপচয় হচ্ছে এবং মানব জীবনের প্রধান প্রয়োজন পারমার্থিক উপলব্ধি লাভ হচ্ছে না। চন্দ্রে যাওয়ার প্রচেষ্টা শক্তির অনর্থক অপচয়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত। কেননা মানুষ যদি চন্দ্রলোকে গমন করেও, তাহলেও তার জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান হবে না। ভগবদ্ভক্তদের বলা হয় *অকিঞ্চন*, কেননা তাদের কোন জাগতিক সম্পদ নেই। এই প্রকার জড় সম্পদগুলি প্রকৃতির তিনটি গুণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সেগুলি চিন্ময় শক্তিকে ব্যর্থ করে দেয়, এবং তাই আমাদের কাছে জড়া প্রকৃতির এই সমস্ত জিনিষগুলি যত কম থাকে পারমার্থিক প্রগতির পথে ততই ভাল।

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জড়জাগতিক কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ, যা এই জড় জগতেও প্রদর্শিত হয়, তা চিন্ময় এবং জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বলেছেন যে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ, এমনকি এই জড় জগতে তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাবও চিন্ময়, এবং যিনি তা তত্ত্বত জানেন তাঁকে আর পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার লালসাই ভবরোগের কারণ। প্রকৃতির তিনটি গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে এই লালসার উদয় হয়, কিন্তু ভগবান অথবা তাঁর ভক্ত এই প্রকার মিথ্যা ভোগের প্রতি আসক্ত হন না। তাই ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের বলা হয় *নিবৃত্ত-গুণ-বৃত্তি* । আদর্শ *নিবৃত্ত-গুণ-বৃত্তি* হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কেননা তিনি কখনো জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হন না; কিন্তু জীবের সেই প্রবণতা রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে জড় জগতের এই মোহময়ী আকর্ষণের দ্বারা আবদ্ধ হয়।

যেহেতু ভগবান হচ্ছেন তাঁর ভক্তের সম্পদ এবং ভক্তও হচ্ছেন ভগবানের সম্পদ, তাই ভক্তগণ অবশ্যই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। সেটিই হচ্ছে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। এই প্রকার অনন্য ভক্তগণ কর্মমিশ্রা ভক্ত এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তদের থেকে ভিন্ন। ভগবান এবং তাঁর অনন্য ভক্ত পরস্পরের প্রতি আসক্ত। অন্যদের কাছ থেকে ভগবানের দেওয়ার বা নেওয়ার কিছুই নেই, এবং তাই তাঁকে বলা হয় *আত্মারাম*, অর্থাৎ যিনি আত্মতৃপ্ত। *আত্মারাম* হওয়ার ফলে তিনি অদ্বৈতবাদীদের ঈশ্বর, যারা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায়। এই প্রকার অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতি নামক ভগবানের অঙ্গজ্যোতিতে লীন হয়ে যায়, কিন্তু ভক্তরা ভগবানের চিন্ময় লীলায় প্রবেশ করেন, যাকে কখনো প্রাকৃত বলে ভুল করা উচিত নয়।

শ্লোক ২৮

মন্যে ত্বাং কালমীশানমনাদিনিধনং বিভুম্।
সমং চরন্তং সর্বত্র ভূতানাং যন্মিথঃ কলিঃ ॥ ২৮ ॥

মন্যে—আমি মনে করি; **ত্বাম্**—তুমি; **কালম্**—নিত্যকাল; **ঈশানম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনাদিনিধনম্**—আদি এবং অন্তহীন; **বিভুম্**—সর্বব্যাপ্ত; **সমম্**—সমভাবে কৃপাশীল; **চরন্তম্**—বিতরণকারী; **সর্বত্র**—সর্বস্থানে; **ভূতানাম্**—জীবদের; **যৎ মিথঃ**—পরস্পর; **কলিঃ**—কলহ।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, আমি মনে করি যে তুমি নিত্যকালস্বরূপ, পরম নিয়ন্তা, আদি এবং অন্তহীন এবং সর্বব্যাপ্ত। তুমি সমভাবে সকলের প্রতি তোমার করুণা বিতরণ কর। পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগের ফলে জীবের মধ্যে কলহ হয়।

তাৎপর্য

কুন্তীদেবী জানতেন যে, কৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা তাঁর পিতৃকুলের একজন সাধারণ সদস্য ছিলেন না। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, কৃষ্ণ আদিপুরুষ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। ভগবানের পরমাত্মা প্রকাশের আরেকটি নাম *কাল*। শাশ্বত কাল আমাদের ভাল এবং মন্দ সমস্ত কর্মের সাক্ষী এবং এইভাবে তিনি কর্মের ফল প্রদান করে থাকেন। আমরা যে কেন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছি তা আমরা জানি না, সে কথা বলে কোন লাভ নেই। যে দুষ্কর্মের ফলে আমরা এখন দুঃখ-দুর্দশা

ভোগ করছি তা আমরা ভুলে যেতে পারি, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে পরমাত্মা আমাদের নিত্য সঙ্গী এবং তাই তিনি আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানেন। আর যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে সমস্ত কর্ম এবং তার ফল নির্ধারণ করেন, তাই তিনি পরম নিয়ন্তাও। তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে একটি তৃণও নড়তে পারে না। জীবকে তার যোগ্যতা অনুসারে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়েছে, এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করার ফলে তাকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। ভগবানের ভক্তেরা কখনো তাঁদের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন না, তাই তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের সুসন্তান। কিন্তু যারা তার অপব্যবহার করে, তাদের শাশ্বত কালের প্রভাবে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। কাল বদ্ধজীবদের সুখ এবং দুঃখ উভয়ই দান করে। এ সবই শাশ্বত কালের দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত। আমাদের যেমন না চাইতে দুঃখ-দুর্দশা আসে, তেমনই সুখও আসে, কেননা সে সবই কালের দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত। তাই কেউই ভগবানের শত্রু অথবা বন্ধু নয়। সকলেই তাদের নিজেদের কর্ম অনুসারে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করছে। জীবের এই ভাগ্য নির্ধারিত হয় তার সামাজিক আদানপ্রদানের ফলে। এখানে সকলেই জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়, এবং তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বাবধানে সকলেই নিজের নিজের ভাগ্য রচনা করে। তিনি সর্বব্যাপ্ত, এবং তাই তিনি সকলেরই কার্যকলাপ দেখতে পান। আর যেহেতু তাঁর আদি বা অন্ত নেই, তাই তিনি কাল নামেও পরিচিত।

শ্লোক ২৯

ন বেদ কশ্চিদ্ভগবংশ্চিকীর্ষিতং
তবেহমানস্য নৃণাং বিড়ম্বনম্ ।
ন যস্য কশ্চিদ্দয়িতোঽস্তি কর্হিচিদ্
দ্বেষ্যশ্চ যস্মিন্ বিষমা মতির্নৃণাম্ ॥ ২৯ ॥

ন—করে না; **বেদ**—জানা; **কশ্চিৎ**—যে কেউ; **ভগবন্**—হে ভগবান; **চিকীর্ষিতম্**—লীলা; **তব**—তোমার; **ঈহমানস্য**—বিষয়ী মানুষের মতো; **নৃণাম্**—জনসাধারণের; **বিড়ম্বনম্**—বিভ্রান্তিজনক; **ন**—কখনোই না; **যস্য**—যাঁর; **কশ্চিৎ**—কেউ; **দয়িতঃ**—বিশেষ কৃপার পাত্র; **অস্তি**—হয়; **কর্হিচিৎ**—কোথাও; **দ্বেষ্যঃ**—বিদ্বেষের পাত্র; **চ**—এবং; **যস্মিন্**—তাঁকে; **বিষমা**—পক্ষপাতিত্ব; **মতিঃ**—ধারণা; **নৃণাম্**—মানুষের।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, তোমার অপ্রাকৃত লীলা কেউই বুঝতে পারে না, যা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মতো বলে মনে হয় এবং তাই তা বিভ্রান্তিজনক। কেউই তোমার বিশেষ কৃপার অথবা বিদ্বেষের পাত্র নয়। মানুষ কেবল অজ্ঞতাবশত মনে করে যে তুমি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ।

তাৎপর্য

পতিত জীবদের প্রতি ভগবানের করুণা সমভাবে বর্ষিত হয়। কেউই তাঁর শত্রু নয়। ভগবানকে একজন মানুষ বলে মনে করা একটি মস্ত বড় ভুল। তাঁর লীলা ঠিক মানুষের মতো বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে জড় কলুষের স্পর্শমাত্র নেই এবং তা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। নিঃসন্দেহে তাঁকে তাঁর শুদ্ধভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না, ঠিক যেমন সূর্য কখনো কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। সূর্যকিরণের সদ্ব্যবহারের ফলে কখনো কখনো পাথরও মূল্যবান হয়ে ওঠে, কিন্তু একজন অন্ধ সেই সূর্যকিরণের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও সূর্যকে দেখতে পায় না। আলো এবং অন্ধকার দুটি বিপরীতমুখী ধারণা, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সূর্য তার কিরণ বিতরণে পক্ষপাতিত্ব করে। সূর্যকিরণ সকলের কাছেই উন্মুক্ত, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের গ্রহণ করার ক্ষমতার জন্য তার তারতম্য হয়। মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে বিশেষ কৃপা লাভের জন্য ভগবানের তোষামোদ করা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত শুদ্ধভক্তেরা ব্যবসায়ী নন। একজন ব্যবসায়ী লাভের আশায় অন্য কারও সেবা করে। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধভক্ত এই প্রকার কোন কিছুর প্রত্যাশায় ভগবানের সেবা করেন না, এবং তাই ভগবানের পূর্ণ কৃপা তাঁর উপর বর্ষিত হয়। আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানীরা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানের সঙ্গে সাময়িক সম্পর্ক স্থাপন করে। যখন তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তখন আর ভগবানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। আর্ত-ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয়, তাহলে সে আরোগ্যের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আরোগ্য লাভের পর সে আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন মনে করে না। ভগবান তাকে কৃপা করছেন, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। এটিই হচ্ছে শুদ্ধভক্ত এবং মিশ্রভক্তের মধ্যে পার্থক্য। যারা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবাবিমুখ, তাদের গভীর তমসাচ্ছন্ন বলে বিবেচনা করা হয়। যারা কেবল প্রয়োজনের সময়ই ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করে, তারা আংশিকভাবে ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হয়। আর যারা পূর্ণরূপে ভগবানের

সেবায় যুক্ত, তারা পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপাভাজন। ভগবানের কৃপা লাভের ব্যাপারে এই পক্ষপাতিত্ব নির্ভর করে গ্রহীতার উপর, তা কখনোই পরম কৃপাময় ভগবানের পক্ষপাতিত্বের ফলে নয়।

ভগবান যখন তাঁর পূর্ণ কৃপাশক্তির প্রভাবে এই জড় জগতে অবতরণ করেন এবং একজন মানুষের মতো লীলা বিলাস করেন, তখন মনে হতে পারে যে ভগবান কেবল তাঁর ভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। আপাতদৃষ্টিতে এই পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও তাঁর করুণা সমভাবে সকলের উপর বর্ষিত হয়। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যাঁরা ভগবানের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও মুক্তিলাভ করেছিলেন; কেননা ভগবানের উপস্থিতিতে মৃত্যু হলে সেই আত্মা তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং তার ফলে তিনি ভগবানের ধামে স্থান লাভ করেন। যে কোন প্রকারেই হোক না কেন কেউ যদি সূর্যকিরণের সান্নিধ্যে আসে, তাহলে সে সূর্যকিরণের তাপ এবং অতিবেগুনী-রশ্মির সুফল লাভ করে। তাই চরমে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ভগবান কারোরই প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। যারা তা মনে করে তাদের সেই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

শ্লোক ৩০

জন্ম কর্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্তুরাত্মনঃ।
তির্যঙ্নৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৩০ ॥

জন্ম—জন্ম; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **চ**—এবং; **বিশ্বাত্মন্**—হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মা; **অজস্য**—যিনি জন্মরহিত তাঁর; **অকর্তুঃ**—যিনি প্রাকৃত কর্মরহিত তাঁর; **আত্মনঃ**—প্রাণশক্তিময় আত্মার; **তির্যক্**—পশু; **নৃ**—মানুষ; **ঋষিষু**—ঋষিদের; **যাদঃসু**—জলে; **তৎ**—তা; **অত্যন্ত**—অতি; **বিড়ম্বনম্**—মোহজনক।

অনুবাদ

হে বিশ্বাত্মা, তুমি প্রাকৃত কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও কর্ম কর, তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত এবং সকলের পরমাত্মা হওয়া সত্ত্বেও জন্মগ্রহণ কর। তুমি পশু, মানুষ, ঋষি এবং জলচর কুলে অবতরণ কর। স্পষ্টতই এ সমস্ত অত্যন্ত বিমোহিতকর।

তাৎপর্য

ভগবানের চিন্ময় লীলা কেবল বিমোহিতকরই নয়, তা আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধভাবসমন্বিতও। পক্ষান্তরে বলা যায় যে তা মানুষের সীমিত চিন্তাশক্তির অতীত।

ভগবান হচ্ছেন সমস্ত অস্তিত্বের সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা, তথাপি তিনি পশুদের মধ্যে শূকররূপে, মানবকুলের মধ্যে রাম, কৃষ্ণ আদি রূপে, ঋষিদের মধ্যে নরনারায়ণরূপে এবং জলচরদের মধ্যে মীনরূপে অবতীর্ণ হন। তথাপি তাঁকে বলা হয় অজ, এবং এই জগতে তাঁর করণীয় কিছুই নেই। শ্রুতি-মন্ত্রে বলা হয়েছে যে পরম ব্রহ্মের করণীয় কিছুই নেই। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয় অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। তাঁর বিবিধ শক্তি রয়েছে, এবং তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান, বল এবং ক্রিয়ার দ্বারা সবকিছু সম্পন্ন হয়। এই সমস্ত উক্তি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ভগবানের লীলা, রূপ এবং কার্যকলাপ আমাদের সীমিত চিন্তাশক্তির অতীত, এবং যেহেতু তিনি অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন তাই তাঁর পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। তাই কেউই তাঁকে সঠিকভাবে অনুমান করতে পারে না। ভগবানের প্রতিটি কার্য সাধারণ মানুষের পক্ষে বিমোহিতকর। বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না, কিন্তু শুদ্ধভক্তরা তাঁকে সহজেই জানতে পারেন, কেননা তাঁরা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত। ভক্তেরা তাই জানেন যে যদিও তিনি পশুকুলে আবির্ভূত হন, তথাপি তিনি পশু নন, মানবকুলের মধ্যে আবির্ভূত হলেও তিনি মানুষ নন, ঋষিদের মধ্যে আবির্ভূত হলেও তিনি ঋষি নন এবং জলচরদের মধ্যে আবির্ভূত হলেও তিনি মৎস্য নন। সর্ব অবস্থাতেই তিনি শাশ্বত পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ৩১

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্ ।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥ ৩১ ॥

গোপী—গোপরমণী (যশোদা); **আদদে**—গ্রহণ করেছিলেন; **ত্বয়ি**—তোমার; **কৃতাগসি**—অপরাধ করেছিলে (দধিভাণ্ডভঙ্গ করে); **দাম**—রজ্জু; **তাবৎ**—তখন; **যা**—যা; **তে**—তোমার; **দশা**—অবস্থা; **অশ্রু-কলিল**—অশ্রু-প্লাবিত; **অঞ্জন**—কাজল; **সম্ভ্রম**—উদ্বিগ্ন; **অক্ষম্**—নয়ন; **বক্ত্রম্**—মুখমণ্ডল; **নিনীয়**—নত করে; **ভয়-ভাবনয়া**—ভয়ের ভাবনায়; **স্থিতস্য**—অবস্থার; **সা**—সেই; **মাম্**—আমাকে; **বিমোহয়তি**—বিমোহিত করে; **ভীঃ-অপি**—এমন কি স্বয়ং ভয়; **যৎ**—যিনি; **বিভেতি**—ভয় পান।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, দধিভাণ্ড ভঙ্গ করার অপরাধে যশোদা যখন তোমাকে বন্ধন করার জন্য রজ্জু গ্রহণ করেছিলেন, তখন তোমার নয়ন অশ্রুর দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল এবং তা তোমার নয়নের অঞ্জন বিধৌত করেছিল। স্বয়ং ভয়েরও ভয়স্বরূপ তুমি তখন ভয়ে ভীত হয়েছিলে। তোমার সেই অবস্থা আমার কাছে এখনও বিমোহিতকর।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানের লীলাজনিত মোহের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান সর্ব অবস্থাতেই পরম, যা ইতিমধ্যেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে ভগবানের পরম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শুদ্ধভক্তের কাছে খেলার সামগ্রী হওয়ার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধভক্ত তাঁর প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের প্রভাবেই তাঁর সেবা করেন, এবং এইভাবে সেবা করার ফলে শুদ্ধভক্ত তাঁর পরমেশ্বরত্বের কথা ভুলে যান। পরমেশ্বর ভগবানও ঐশ্বর্যভাববিহীন এই স্বতঃস্ফূর্ত শুদ্ধপ্রেমের প্রভাবে সম্পাদিত তাঁর ভক্তের সেবা অধিক আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন। সাধারণত ভক্তেরা সম্ভ্রম সহকারে ভগবানের আরাধনা করেন, কিন্তু ভক্ত যখন শুদ্ধপ্রেমের বশবর্তী হয়ে ভগবানকে কনিষ্ঠ জ্ঞানে সেবা করেন তখন ভগবান বিশেষভাবে প্রসন্ন হন। ভগবানের নিত্য ধাম গোলোক বৃন্দাবনে তাঁর সমস্ত লীলা এই বিশেষ মনোভাবের দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাঁর সখারা তাঁকে তাঁদেরই একজন বলে মনে করেন। তাঁরা তাঁকে সম্মানিত কোন ব্যক্তি বলে মনে করেন না। ভগবানের পিতামাতারা (যাঁরা হচ্ছেন তাঁর শুদ্ধভক্ত) মনে করেন যে তিনি কেবল তাঁদের সন্তান। ভগবানের কাছে তাঁর পিতামাতার শাসন বেদস্তুতির থেকেও অধিক আনন্দদায়ক। তেমনই তাঁর প্রেয়সীদের ভর্ৎসনা তাঁর কাছে অধিক মনোরম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সাধারণ মানুষদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় তাঁর চিন্ময় গোলোক বৃন্দাবনের নিত্য লীলা প্রকাশ করার জন্য এই জড় জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর মাতা যশোদার বশ্যতা স্বীকার করে এক অতুলনীয় লীলা প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবান তাঁর স্বাভাবিক শিশুসুলভ চপলতায় মা যশোদার সঞ্চিত ননী এবং দধির ভাণ্ড ভঙ্গ করে সেগুলি তাঁর খেলার সাথীদের মধ্যে এবং বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বানরদের মধ্যে বিতরণ করতেন, যাঁরা তাঁর উদারতার সুযোগ গ্রহণ করত। মা যশোদা তা দেখতে পেয়ে শুদ্ধপ্রেমের প্রভাবে তাঁর দিব্য শিশুটিকে দণ্ড দেওয়ার অভিনয় করেছিলেন। তিনি একটি রজ্জু নিয়ে ভগবানকে বন্ধন করার ভয় দেখিয়েছিলেন, যা একজন সাধারণ শিশুর ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। মা যশোদার হাতে সেই রজ্জুটি দর্শন করে

ভগবান নত মস্তকে একটি সাধারণ শিশুর মতো অশ্রুবর্ষণ করতে থাকেন, এবং সেই অশ্রু তাঁর সুন্দর নয়নযুগলের অঞ্জন ধৌত করে গাল বেয়ে ঝরে পড়তে থাকে। কুন্তীদেবী এখানে ভগবানের সেই লীলাটির মহিমা কীর্তন করেছেন, কেননা তিনি ভগবানের পরম পদ সম্বন্ধে অবগত। স্বয়ং ভয়ও তাঁকে ভয় করে, তথাপি তিনি তাঁর মায়ের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন যিনি তাঁকে একটি সাধারণ শিশুর মতো দণ্ড দিতে চেয়েছিলেন। কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, কিন্তু মা যশোদা ছিলেন না। তাই মা যশোদার পদ কুন্তীদেবীর থেকে ঊর্ধ্বে। মা যশোদা ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁকে বুঝতে দেননি যে তাঁর পুত্রটি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। মা যশোদা যদি ভগবানের ভগবত্তা সম্বন্ধে সচেতন হতেন তাহলে তিনি অবশ্যই তাঁকে দণ্ড দিতেই ইতস্তত করতেন। কিন্তু ভগবান তাঁকে তাঁর সেই অবস্থা সম্বন্ধে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন, কেননা তিনি মমতাময়ী মা যশোদার সম্মুখে ঠিক একটি শিশুর মতো আচরণ করতে চেয়েছিলেন। মাতা ও পুত্রের এই স্নেহের বিনিময় স্বাভাবিকভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং কুন্তীদেবী সেই দৃশ্য স্মরণ করে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তিনি সেই দিব্য বাৎসল্য প্রেমের প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি। পরোক্ষভাবে মা যশোদার অতুলনীয় প্রেমের প্রশংসা করা হয়েছিল, কেননা তিনি সর্বশক্তিমান ভগবানকেও তাঁর প্রিয় পুত্ররূপে বশীভূত করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্য কীর্তয়ে।
যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনম্ ॥ ৩২ ॥

কেচিৎ—কেউ; **আহুঃ**—বলেন; **অজম্**—অজ বা প্রাকৃত জন্মরহিত; **জাতম্**—জন্মগ্রহণ করে; **পুণ্য-শ্লোকস্য**—মহা পুণ্যবান রাজা; **কীর্তয়ে**—মহিমান্বিত করার জন্য; **যদোঃ**—মহারাজ যদুর; **প্রিয়স্য**—প্রিয় পাত্রের; **অন্ববায়ে**—বংশে; **মলয়স্য**—মলয় পর্বতের; **ইব**—যেমন; **চন্দনম্**—চন্দন।

অনুবাদ

কেউ কেউ বলেন পুণ্যবান রাজাদের মহিমান্বিত করার জন্য অজ জন্মগ্রহণ করেছে, এবং কেউ কেউ বলেন তোমার অন্যতম প্রিয়ভক্ত যদুর আনন্দ বিধানের

জন্য তুমি জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও যদু বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। মলয় পর্বতের যশ বৃদ্ধির জন্য যেমন সেখানে চন্দন বৃক্ষের জন্ম হয়, তেমনই তুমি মহারাজ যদুর বংশে জন্মগ্রহণ করেছ।

তাৎপর্য

যেহেতু এই জড় জগতে ভগবানের আবির্ভাব বিমোহিতকর, তাই প্রাকৃত জন্মরহিত ভগবানের জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত রয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, সমগ্র সৃষ্টির ঈশ্বর এবং প্রাকৃত জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি নিজেই যখন সেই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তখন সেই অজ বা প্রাকৃত জন্মরহিতের জন্ম অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত রয়েছে। তাও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি ধর্ম সংস্থাপনের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হন। সেটিই হচ্ছে জন্মরহিত ভগবানের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। তথাপি বলা হয়েছে যে পুণ্যাত্মা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মহিমান্বিত করার জন্য ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই পৃথিবীর সকলের মঙ্গলের জন্য পাণ্ডবদের রাজ্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কোন পুণ্যবান রাজা যখন পৃথিবী শাসন করেন, তখন মানুষ সুখী হয়। কিন্তু রাজা যদি অধার্মিক হয় তা হলে মানুষ অসুখী হয়। কলিযুগে অধিকাংশ শাসকই অধার্মিক, এবং তাই নাগরিকেরা সর্বদাই অসুখী। কিন্তু গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অধার্মিক নাগরিকেরা তাদের শাসন করার জন্য নিজেরাই নেতা নির্বাচন করে, এবং তাই তাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য তারা অন্য কাউকেই দোষ দিতে পারে না। মহারাজ নল ছিলেন একজন বিখ্যাত পুণ্যবান রাজা, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মহিমান্বিত হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন। ভগবান ইতিমধ্যেই মহারাজ যদুকে মহিমান্বিত করেছেন তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে। যদিও তিনি যাদব, যদুবীর, যদুনন্দন ইত্যাদি নামে পরিচিত, কিন্তু তিনি সর্বদাই এই সমস্ত কৃতজ্ঞতাজনিত বাধকতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তিনি ঠিক মলয় পর্বতে উৎপন্ন চন্দনের মতো। বৃক্ষ যে কোন জায়গায় এবং সর্বত্র উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু যেহেতু চন্দন বৃক্ষ সাধারণত মলয় পর্বতে উৎপন্ন হয় তাই চন্দন এবং মলয় পর্বত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে ভগবান জন্মরহিত, ঠিক যেমন সূর্য সর্বদা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মানুষের দৃষ্টিতে পূর্ব দিগন্তে উদিত হচ্ছে বলে মনে হয়। তেমনই, ভগবান সকলেরই পরম পিতা এবং তিনি কারো পুত্র নন, ঠিক যেমন সূর্য কখনই পূর্ব দিগন্তের সূর্য নয়।

শ্লোক ৩৩

অপরে বসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোঽভ্যগাৎ।
অজস্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায় চ সুরদ্বিষাম্ ॥ ৩৩ ॥

অপরে—অন্য কেউ; বসুদেবস্য—বসুদেবের; দেবক্যাং—দেবকীর; যাচিতঃ—প্রার্থিত হয়ে; অভ্যগাৎ—জন্মগ্রহণ করেছিলে; অজঃ—জন্মরহিত; ত্বম্—তুমি; অস্য—তাঁর; ক্ষেমায়—মঙ্গলের জন্য; বধায়—বধ করার জন্য; চ—এবং; সুরদ্বিষাম্—ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরদের।

অনুবাদ

অন্য কেউ কেউ বলেন যে বসুদেব এবং দেবকী তোমার কাছে প্রার্থনা করায় তুমি তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত, তথাপি তুমি তাঁদের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং দেববিদ্বেষী অসুরদের সংহার করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছ।

তাৎপর্য

কথিত হয় যে বসুদেব এবং দেবকী তাঁদের পূর্বজন্মে ছিলেন সুতপা এবং পৃশ্নি, এবং তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তার ফলে ভগবান তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ঘোষণা করা হয়েছে যে ভগবান জগতের সমস্ত জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং অসুর বা জড়বাদী নাস্তিকদের বিনাশ করার জন্য আবির্ভূত হন।

শ্লোক ৩৪

ভারাবতারণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদধৌ।
সীদন্ত্যা ভূরিভারেণ জাতো হ্যাত্মভুবার্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

ভার-অবতারণায়—ভার হরণ করার জন্য; অন্যে—অন্য কেউ; ভুবঃ—পৃথিবীর; নাবঃ—নৌকা; ইব—মতো; উদধৌ—সমুদ্রে; সীদন্ত্যাঃ—মর্মাহত; ভূরি—অত্যন্ত; ভারেণ—ভারে; জাতঃ—জন্মগ্রহণ করেছিলে; হি—অবশ্যই; আত্ম-ভুবা—ব্রহ্মার দ্বারা; অর্থিতঃ—প্রার্থিত হয়ে।

অনুবাদ

অন্যেরা বলেন যে সমুদ্রের মধ্যে নৌকার মতো পৃথিবী অতি ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে দারুণভাবে পীড়িত হলে তোমার পুত্র ব্রহ্মা তোমার কাছে প্রার্থনা জানায়, আর তাই তুমি সেই ভার হরণ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছ।

তাৎপর্য

সৃষ্টির ঠিক পরেই প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা হচ্ছেন নারায়ণের সাক্ষাৎ পুত্র। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে নারায়ণ প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। চিন্ময় সংযোগ ব্যতীত জড় পদার্থ কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টির আদিতেই এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। পরম-আত্মা ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন, এবং প্রথম জীব ব্রহ্মা তাঁর চিন্ময় নাভি থেকে উদ্ভূত একটি পদ্মফুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই বিষ্ণুকে বলা হয় *পদ্মনাভ* । ব্রহ্মাকে বলা হয় *আত্মভূ* , কেননা তিনি সরাসরিভাবে তাঁর পিতার থেকে মাতা লক্ষ্মীদেবীর সংস্পর্শ ব্যতীতই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের সন্নিকটে তাঁর সেবায় যুক্ত ছিলেন, তথাপি লক্ষ্মীদেবীর সংস্পর্শ ব্যতীতই নারায়ণ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন। সেটিই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা। যারা মূর্খতাবশত নারায়ণকে অন্য জীবেদের সমতুল্য বলে মনে করে, এই দৃষ্টান্তটি থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। নারায়ণ কোন সাধারণ জীব নন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর চিন্ময় অঙ্গের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ অন্যান্য প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের কার্য করতে সক্ষম। একজন সাধারণ জীব মৈথুনের মাধ্যমে সন্তান উৎপন্ন করে, এছাড়া তার সন্তান লাভের আর কোন উপায় নেই। কিন্তু নারায়ণ সর্বশক্তিমান হওয়ার ফলে কোন প্রকার শক্তির বন্ধনে আবদ্ধ নন। তিনি পূর্ণ এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি যা ইচ্ছা তাই অনায়াসে এবং পূর্ণরূপে সম্পাদন করতে সক্ষম। তাই ব্রহ্মা মাতৃগর্ভে অবস্থান না করেই সরাসরিভাবে তাঁর পিতা থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তাই তাঁকে বলা হয় আত্মভূ। এই ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির কর্তা, এবং তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট। ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নামে একটি চিন্ময় লোক রয়েছে, যা পরমেশ্বর ভগবানের পরমাত্মা রূপ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর ধাম। ব্রহ্মাণ্ডে যখনই কোন সঙ্কট দেখা দেয় তখনই তা সমাধান করার জন্য বিভিন্ন বিভাগের অধিকর্তা দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন, এবং ব্রহ্মা যদি তা সমাধান করতে না পারেন তাহলে তিনি ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কাছে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য এবং তাঁর অবতরণের জন্য প্রার্থনা করেন। এই রকম একটি সঙ্কট দেখা দিয়েছিল যখন কংস এবং অন্যান্য আসুরিক রাজাদের দুষ্কর্মের ফলে পৃথিবী

ভারাক্রান্ত হয়েছিল। ব্রহ্মা তখন অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, এবং ভগবান তখন তাঁদের জানিয়েছিলেন যে বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে তিনি তাঁর কৃষ্ণ-স্বরূপে অবতরণ করবেন। তাই কেউ কেউ বলেন যে ভগবান ব্রহ্মার প্রার্থনার জন্য অবতরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্মভিঃ ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥ ৩৫ ॥

ভবে—জড় জগতে; **অস্মিন্**—এই; **ক্লিশ্যমানানাম্**—দুর্দশাক্লিষ্ট ব্যক্তিদের; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানতা; **কাম**—কামনা-বাসনা; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্ম; **শ্রবণ**—শ্রবণ; **স্মরণ**—স্মরণ; **অর্হাণি**—আরাধনা; **করিষ্যন্**—করতে পারে; **ইতি**—এইভাবে; **কেচন**—অন্য কেউ।

অনুবাদ

আবার অন্য আরও অনেকে বলেন যে অবিদ্যাজনিত কাম এবং কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধজীবেরা যাতে ভক্তিযোগের সুযোগ নিয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই শ্রবণ, স্মরণ, অর্চন আদি ভক্তিযোগের পন্থাসমূহ পুনঃপ্রবর্তনের জন্য তুমি অবতরণ করেছিলে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে প্রত্যেক যুগে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি অবতরণ করেন। ভগবানই ধর্ম প্রবর্তন করেন। কেউই নতুন ধর্ম তৈরী করতে পারে না, যা আজকাল কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ করছে। প্রকৃত ধর্মের পন্থা হচ্ছে ভগবানকে পরম ঈশ্বররূপে স্বীকার করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে তাঁর সেবা করা। সেবা না করে জীব থাকতে পারে না কেননা সেই উদ্দেশ্যেই তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জীবের একমাত্র কার্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। ভগবান মহান্, এবং জীব তাঁর অধীন। তাই জীবের কর্তব্য হচ্ছে কেবল তাঁরই সেবা করা। দুর্ভাগ্যবশত মোহাচ্ছন্ন জীবেরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে জড়-বাসনার প্রভাবে তাদের ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে যায়। এই বাসনাকে বলা হয় অবিদ্যা। আর এই অবিদ্যার ফলে জীব বিকৃত যৌনজীবনের ভিত্তিতে জড় সুখভোগের জন্য বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা করে। তাই সে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ

হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের পরিচালনায় বিভিন্ন লোকে এক দেহ থেকে আর দেহে দেহান্তরিত হয়। এই অবিদ্যাকে অতিক্রম করতে না পারলে কেউই জড়জাগতিক জীবনের ত্রিতাপ ক্লেশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

পরমেশ্বর ভগবান দুর্দশাক্লিষ্ট জীবেদের প্রতি আশাতীতভাবে কৃপালু হওয়ার ফলে তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদনসমন্বিত ভগবদ্ভক্তির পন্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ভক্তির উপরোক্ত অঙ্গসমূহের সবকটিই বা যে কোন একটি অঙ্গের অনুশীলন বদ্ধজীবকে অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে এবং তার ফলে মায়া কর্তৃক মোহাচ্ছন্ন বদ্ধজীবের জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে জীবদের উপর এই বিশেষ কৃপা বর্ষণ করেছেন।

শ্লোক ৩৬

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥ ৩৬ ॥

শৃণ্বন্তি—শ্রবণ করেন; **গায়ন্তি**—কীর্তন করেন; **গৃণন্তি**—গ্রহণ করেন; **অভীক্ষ্ণশঃ**—নিরন্তর; **স্মরন্তি**—স্মরণ করেন; **নন্দন্তি**—আনন্দিত হন; **তব**—তোমার; **ঈহিতং**—কার্যকলাপ; **জনাঃ**—মানুষেরা; **তে**—তাঁরা; **এব**—অবশ্যই; **পশ্যন্তি**—দেখতে পান; **অচিরেণ**—শীঘ্রই; **তাবকম্**—তোমার; **ভব-প্রবাহ**—জন্ম-মৃত্যুর স্রোত; **উপরমম্**—নিবৃত্তি; **পদাম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

হে শ্রীকৃষ্ণ, যাঁরা তোমার অপ্রাকৃত চরিত-কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, স্মরণ করেন, এবং অবিরাম উচ্চারণ করেন, অথবা অন্যে তা করলে আনন্দিত হন, তাঁরা অবশ্যই তোমার শ্রীপাদপদ্ম অচিরেই দর্শন করতে পারেন, যা একমাত্র জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকে নিবৃত্ত করতে পারে।

তাৎপর্য

আমাদের বর্তমান বদ্ধদৃষ্টির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা সম্ভব নয়। তাঁকে দর্শন করতে হলে স্বতঃস্ফূর্ত ভগবৎ-প্রেম সমন্বিত ভিন্ন প্রকার

জীবনধারা বিকাশের মাধ্যমে আমাদের এই বর্তমান দৃষ্টির পরিবর্তন করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং এই পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন সকলেই তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে দর্শন করতে পারেনি। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল আদি জড়বাদীরা জড় সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিল, কিন্তু তারা ভগবানকে বুঝতে পারেনি। তাই ভগবান আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত থাকলেও উপযুক্ত দৃষ্টিশক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তাঁকে দর্শন লাভ করা সম্ভব নয়। এই যোগ্যতার উদয় হয় একমাত্র ভগবদ্ভক্তির দ্বারা, যা শুরু হয় উপযুক্ত সূত্র থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* হচ্ছে অন্যতম একটি জনপ্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ, যা সাধারণ মানুষ শ্রবণ, কীর্তন, পাঠ ইত্যাদি করে থাকে, কিন্তু এই প্রকার শ্রবণাদি সত্ত্বেও অনুশীলনকারী প্রত্যক্ষরূপে ভগবান দর্শন করতে পারে না। শ্রবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রবণ করা হয়, তাহলে তার সুফল অতি শীঘ্র লাভ করা যায়। সাধারণত মানুষ অযোগ্য ব্যক্তিদের কাছে শ্রবণ করে থাকে। এই প্রকার অযোগ্য ব্যক্তিরা জড়বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মহাপণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তারা ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিয়ম পালন করে না, তাই তাদের কাছে শ্রবণ কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। কখনো কখনো তারা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মূল শ্লোকের অর্থ বিকৃত করে ব্যাখ্যা করে। তাই প্রথমে উপযুক্ত এবং যোগ্য পাঠক খুঁজে তাঁর কাছে শ্রবণ করতে হয়। শ্রবণের বিধি যখন যথাযথ এবং পূর্ণ হয়, তখন অন্যান্য পন্থাগুলিও আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যায়।

ভগবানের বিভিন্ন প্রকার দিব্য কার্যকলাপ রয়েছে, এবং যদি শ্রবণাঙ্গ বিধি পূর্ণরূপে সম্পাদন করা হয়, তাহলে সেগুলি প্রত্যেকটিই বাঞ্ছিত ফল প্রদানে সমর্থ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবানের কার্যকলাপ পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর আচরণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। অসুর এবং অন্যান্যদের সঙ্গে ভগবানের আচরণের ভিত্তিতে তাঁর বহু লীলা রয়েছে। আর দশম স্কন্ধে তাঁর প্রণয়িনী গোপিকাদের সঙ্গে তাঁর অপূর্ব আচরণ এবং দ্বারকায় তাঁর বিবাহিত পত্নীদের সঙ্গে তাঁর আচরণের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান যেহেতু পরম তত্ত্ব, তাই তাঁর বিভিন্ন আচরণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবুও কখনো কখনো কিছু মানুষ অবৈধ শ্রবণের ফলে গোপিকাদের সঙ্গে তাঁর দিব্য আচরণের বিষয় শ্রবণে অধিক আগ্রহী হয়। এই প্রকার প্রবণতা শ্রোতার কামুক মনোভাবের পরিচায়ক, তাই ভগবানের দিব্য চরিত বর্ণনের আদর্শ বক্তা কখনো এই প্রকার শ্রবণ অনুমোদন করেন না। মানুষের কর্তব্য *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত ভগবানের কথা শুরু থেকে শ্রবণ করা, এবং তা শ্রোতাকে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভে সহায়তা করবে। তাই কখনোই মনে করা উচিত

নয় যে পাণ্ডবদের সঙ্গে ভগবানের আচরণ গোপিকাদের সঙ্গে তাঁর আচরণ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে ভগবান সব রকম আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। ভগবানের উপরোক্ত সবকটি আচরণে সর্ব অবস্থাতেই তিনি হচ্ছেন নায়ক, এবং তাঁর সম্বন্ধে অথবা তাঁর ভক্তের সম্বন্ধে অথবা তাঁর প্রতিযোগীদের সম্বন্ধে শ্রবণ করা পারমার্থিক জীবনের ক্ষেত্রে অনুকূল। কথিত হয় যে বেদ, পুরাণ আদি শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই সমস্ত শাস্ত্র শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৩৭

অপ্যদ্য নস্ত্বং স্বকৃতেহিত প্রভো
জিহাসসি স্বিৎ সুহৃদোঽনুজীবিনঃ ।
যেষাং ন চান্যদ্ভবতঃ পদাম্বুজাৎ
পরায়ণং রাজসু যোজিতাংহসাম্ ॥ ৩৭

অপি—যদি; অদ্য—আজ; নঃ—আমাদের; ত্বম্—তোমাকে; স্ব-কৃত—স্বয়ং সম্পাদিত; ঈহিত—সমস্ত কর্তব্য; প্রভো—হে প্রভু; জিহাসসি—ত্যাগ করে; স্বিৎ—সম্ভব; সুহৃদঃ—অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ; অনুজীবিনঃ—অনুগ্রহের ফলে জীবিত; যেষাম্—যাঁদের; ন—না; চ—এবং; অন্যৎ—অন্য কেউ; ভবতঃ—তোমার; পদ-অম্বুজাৎ—শ্রীপাদপদ্ম থেকে; পরায়ণম্—নির্ভরশীল; রাজসু—রাজাদের প্রতি; যোজিত—নিয়োজিত; অংহসাম্—শত্রুতা।

অনুবাদ

হে প্রভু, তুমি তোমার সমস্ত কর্তব্য স্বয়ং সম্পাদন করেছ। যদিও আমরা সর্বতোভাবে তোমার কৃপার উপর নির্ভরশীল এবং তুমি ছাড়া আমাদের রক্ষা করার আর কেউ নেই, এবং যখন সমস্ত রাজারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, সেই অবস্থায় তুমি কি আজ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?

তাৎপর্য

পাণ্ডবেরা সবচাইতে ভাগ্যবান, কেননা তাঁদের সৌভাগ্যের ফলে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। জড় জগতে অন্য কারও কৃপার উপর নির্ভর করা সবচাইতে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে আমাদের

চিন্ময় সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা যদি সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপর নির্ভর করতে পারি তাহলে সেটি হচ্ছে সবচাইতে বড় সৌভাগ্য। সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হওয়ার বাসনাটি হচ্ছে ভবরোগের মূল কারণ। কিন্তু নিষ্ঠুর জড়া প্রকৃতি আমাদের কখনো স্বাধীন হতে দেয় না। প্রকৃতির কঠোর নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার ভ্রান্ত প্রচেষ্টাকে জড় বিজ্ঞানের প্রগতি বলে মনে করা হয়। সমগ্র জড় জগৎ প্রকৃতির নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার এই ভ্রান্ত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে এগিয়ে চলেছে। সরাসরিভাবে স্বর্গে যাওয়ার সোপান নির্মাণের অভিলাষী রাবণ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকলেই প্রকৃতির নিয়মকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। তারা এখন বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক শক্তির মাধ্যমে দূরবর্তী গ্রহগুলিতে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু মানব সভ্যতার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কঠোর শ্রম করা এবং তাঁর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়া। আদর্শ সভ্যতার সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হচ্ছে শৌর্যের সঙ্গে কর্ম করা, এবং সেই সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা। সভ্যতার এই মান অনুসারে কার্য সম্পাদনে পাণ্ডবেরা আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা যে ভগবানের সদিচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বলে তাঁরা অলসভাবে ভগবানের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। ব্যক্তিগত চরিত্র এবং দৈহিক সক্রিয়তা উভয় বিচারেই তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য। তথাপি তাঁরা সর্বদাই ভগবানের করুণার উপর নির্ভরশীল ছিলেন কেননা তাঁরা জানতেন প্রতিটি জীবই স্বরূপত ভগবানের উপর নির্ভরশীল। তাই জীবনের প্রকৃত পূর্ণতা হচ্ছে ভ্রান্তভাবে জড় জগতে স্বতন্ত্র হওয়ার চেষ্টা না করে ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হওয়া। যারা ভ্রান্তভাবে ভগবান থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার চেষ্টা করে তাদের বলা হয় *অনাথ*, অর্থাৎ যাদের কোন অভিভাবক নেই; কিন্তু যারা ভগবানের ইচ্ছার উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল তাদের বলা হয় *সনাথ*, অর্থাৎ যাদের রক্ষা করার জন্য কেউ রয়েছে। তাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সনাথ হওয়ার চেষ্টা করা, যাতে জড় অস্তিত্বের প্রতিকূল অবস্থা থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির বিভ্রান্তিকর প্রভাবের ফলে আমরা ভুলে যাই যে জড় জগতের বদ্ধ জীবন হচ্ছে সবচাইতে অবাঞ্ছনীয় বিভ্রান্তি। তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বাসুদেবকে সর্বেসর্বা বলে জানতে পারেন এবং বুঝতে পারেন যে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয়ে জীবন যাপন করাই হচ্ছে সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা। সেটিই মহাত্মার লক্ষণ। পাণ্ডব পরিবারের সমস্ত সদস্যরাই ছিলেন গৃহস্থ আশ্রমে স্থিত মহাত্মা। এই সমস্ত মহাত্মাদের প্রধান ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির

এবং কুন্তীদেবী ছিলেন তাঁর মাতা। তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং সমস্ত পুরাণ, বিশেষ করে *ভাগবত পুরাণের* শিক্ষা পাণ্ডব মহাত্মাদের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাঁদের কাছে ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ঠিক জল থেকে মাছের বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো। তাই শ্রীমতী কুন্তীদেবী সেই বিরহকে বজ্রপাতের মতো মনে করেছিলেন, এবং তাই ভগবানের কাছে তাঁর সমগ্র প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল ভগবানকে তাঁদের সঙ্গে থাকার জন্য রাজি করানো। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যদিও শত্রুপক্ষের সমস্ত রাজারা নিহত হয়েছিল, কিন্তু তাদের পুত্র এবং পৌত্ররা পাণ্ডবদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য তখনও বর্তমান ছিল। এমন নয় যে কেবল পাণ্ডবদেরই সেই শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, আমরা সকলেই সর্বদা সেই রকম পরিস্থিতিতে রয়েছি, এবং তাই জীবন ধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা এবং সেইভাবে সমস্ত জড় জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়া।

শ্লোক ৩৮

কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ ।
ভবতোঽদর্শনং যর্হি হৃষীকাণামিবেশিতুঃ ॥ ৩৮ ॥

কে—কারা; **বয়ম্**—আমাদের; **নাম-রূপাভ্যাম্**—খ্যাতি এবং যোগ্যতাবিহীন; **যদুভিঃ**—যদুদের; **সহ**—সঙ্গে; **পাণ্ডবাঃ**—পাণ্ডবেরা; **ভবতঃ**—তোমার; **অদর্শনম্**—অনুপস্থিতি; **যর্হি**—যেন; **হৃষীকাণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **ইব**—মতো; **ঈশিতুঃ**—জীবদের।

অনুবাদ

জীবাত্মার প্রয়াণ ঘটলেই যেমন কোন দেহের নাম ও যশ শেষ হয়ে যায়, তেমনই তুমি যদি আমাদের না দেখ তাহলে আমাদের সমস্ত যশ ও কীর্তি পাণ্ডব এবং যদুদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

কুন্তীদেবী ভালভাবেই জানতেন যে পাণ্ডবদের অস্তিত্ব ছিল কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য। নিঃসন্দেহে পাণ্ডবেরা তাঁদের নাম এবং যশে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মূর্তিমান ধর্মরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁদের পরিচালিত করছিলেন, এবং যদুগণ ছিলেন তাঁদের মহান মিত্রপক্ষ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাবধান ছাড়া তাঁদের কারুরই কোন অস্তিত্ব নেই।

ঠিক যেমন চেতনাবিহীন শরীরের ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহের দ্বারা পরিচালিত না হলে কারও প্রতিষ্ঠা, শক্তি এবং যশের গর্বে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। জীব সর্বদাই নির্ভরশীল বা আশ্রিত, এবং পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন তার পরম আশ্রয়। তাই, আমরা হয়তো আমাদের জড় জ্ঞানের প্রগতির দ্বারা সমস্ত প্রকার প্রতিরোধকারী ভৌতিক বিষয়ের আবিষ্কার করতে পারি, কিন্তু এই সমস্ত প্রতিরোধমূলক আবিষ্কারগুলি যতই প্রবল হোক না কেন, ভগবানের পরিচালনা ছাড়া সে সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শ্লোক ৩৯

নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেদানীং গদাধর ।
ত্বৎপদৈরঙ্কিতা ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥

ন—না; **ইয়ম্**—আমাদের রাজ্যের এই ভূমি; **শোভিষ্যতে**—শোভা পাবে; **তত্র**—সেখানে; **যথা**—যেমন; **ইদানীং**—এখন; **গদাধর**—হে কৃষ্ণ; **ত্বৎ**—তোমার; **পদৈঃ**—পাদপদ্মের দ্বারা; **অঙ্কিতা**—চিহ্নিত; **ভাতি**—উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছে; **স্বলক্ষণ**—তোমার নিজ লক্ষণসমূহ; **বিলক্ষিতৈঃ**—চিহ্ন দ্বারা।

অনুবাদ

হে গদাধর (শ্রীকৃষ্ণ), আমাদের রাজ্য এখন তোমার শ্রীপাদপদ্মের সুলক্ষণযুক্ত চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয়ে শোভা পাচ্ছে; কিন্তু তুমি চলে গেলে আর তেমন শোভা পাবে না।

তাৎপর্য

ভগবানের চরণে কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন রয়েছে, যেগুলি অন্যান্যদের থেকে ভগবানের পার্থক্য নিরূপণ করে। ভগবানের চরণের তলদেশে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, ছত্র, পদ্ম, চক্র ইত্যাদি চিহ্নসমূহ রয়েছে। যেখানে ভগবান পদচারণ করেন সেখানকার নরম ধূলিতে সেই চিহ্নগুলি অঙ্কিত হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে ছিলেন তখন সেখানকার ভূমি তাঁর পদচিহ্নের দ্বারা এইভাবে অঙ্কিত হয়েছিল, এবং এই সমস্ত শুভ চিহ্নের ফলে পাণ্ডবদের রাজ্য সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। কুন্তীদেবী এই বিশেষ লক্ষণগুলির উল্লেখ করেছিলেন এবং তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে হয়ত দুর্ভাগ্য দেখা দেবে।

শ্লোক ৪০

ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুপক্বৌষধিবীরুধঃ ।
বনাদ্রিনদ্যুদন্বন্তো হ্যেধন্তে তব বীক্ষিতৈঃ ॥ ৪০ ॥

ইমে—এই সমস্ত; **জনপদাঃ**—শহর ও নগরাদি; **স্বৃদ্ধাঃ**—সমৃদ্ধশালী হয়েছে; **সুপক্ব**—পরিপক্ক; **ঔষধি**—ভেষজ; **বীরুধঃ**—বনস্পতি; **বন**—অরণ্য; **অদ্রি**—পর্বত; **নদী**—নদী; **উদন্বন্তঃ**—সমুদ্র; **হি**—অবশ্যই; **এধন্তে**—বর্ধনশীল; **তব**—তোমার; **বীক্ষিতাঃ**—দর্শন প্রভাবে।

অনুবাদ

এই সমস্ত জনপদ সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, কারণ প্রভূত পরিমাণে শস্য ও ঔষধি উৎপন্ন হচ্ছে, বৃক্ষসমূহ পরিপক্ক ফলে পূর্ণ হয়েছে, নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছে, গিরিসমূহ ধাতুতে পূর্ণ হয়েছে এবং সমুদ্র সম্পদে পূর্ণ হয়েছে। আর এ সবই হয়েছে সেগুলির উপর তোমার শুভ দৃষ্টিপাতের ফলে।

তাৎপর্য

মানুষের সমৃদ্ধি আসে প্রকৃতির দান থেকে, বিশাল যান্ত্রিক উদ্যোগ থেকে নয়। বিশাল যান্ত্রিক উদ্যোগগুলি ভগবদ্বিহীন সভ্যতার ফল, এবং সেগুলি মানব জীবনের মহান উদ্দেশ্যের ধ্বংসের কারণ। মানুষের জীবনী-শক্তি নিষ্পেষণ করে এই প্রকার দুর্দশাজনক উদ্যোগগুলি আমরা যতই বৃদ্ধি করব, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ এবং অসন্তোষ ততই বাড়তে থাকবে, যদিও মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ সেক্ষেত্রে সমাজকে শোষণ করে ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ জীবন যাপন করবে। শস্য, শাক-সবজি, ফল, নদী, রত্ন এবং খনিজ ধাতুসমৃদ্ধ পর্বতসমূহ এবং মুক্তায় পূর্ণ সমুদ্রের মতো প্রকৃতির দানগুলি পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে সরবরাহ করা হয়ে থাকে, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জড়া প্রকৃতি সেগুলি উৎপাদন করে অথবা সেগুলির অভাব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে যে মানুষ জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারপূর্বক শোষণমূলক মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে প্রকৃতি প্রদত্ত এই সমস্ত দৈব দানগুলির সদ্ব্যবহার করে সন্তোজনকভাবে সমৃদ্ধিশালী হতে পারে। আমরা আমাদের ভোগ-বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড়া প্রকৃতিকে যতই শোষণ করার চেষ্টা করি, ততই আমরা শোষণ করার চেষ্টাপ্রসূত কর্মফলের প্রতিক্রিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। আমাদের যদি যথেষ্ট শস্য, ফল, শাক-সবজি এবং ওষধি থাকে, তাহলে

কসাইখানায় নিরীহ পশুদের হত্যা করার কি প্রয়োজন? মানুষের যদি খাবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শস্য এবং শাক-সবজি থাকে, তাহলে তাদের পশু হত্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। নদীর জল ক্ষেতকে উর্বর করে এবং তার ফলে আমরা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য লাভ করি। পর্বত থেকে ধাতু এবং নদী থেকে রত্ন লাভ হয়। মানব সভ্যতায় যদি যথেষ্ট পরিমাণে শস্য, ধাতু, রত্ন, জল, দুধ ইত্যাদি থাকে, তাহলে কিছু হতভাগ্য মানুষের কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে ভয়ঙ্কর যান্ত্রিক উদ্যোগগুলির কি প্রয়োজন? তবে প্রকৃতির এই দানগুলি ভগবানের করুণার উপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন হচ্ছে ভগবানের নিয়মের বাধ্য হয়ে এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে মানব জীবনের পূর্ণতা লাভ করা। কুন্তীদেবীর ইঙ্গিতগুলি যথাযথ। তিনি কামনা করেছেন যে ভগবানের কৃপা যেন তাঁদের উপর বর্ষিত হয় যাতে প্রাকৃতিক সমৃদ্ধি বজায় থাকে।

শ্লোক ৪১

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ॥ ৪১ ॥

অথ—তাই; **বিশ্ব-ঈশ**—হে জগদীশ্বর; **বিশ্ব-আত্মন্**—হে সর্বান্তর্যামী; **বিশ্ব-মূর্তে**—হে বিশ্বরূপ; **স্বকেষু**—আত্মীয়-স্বজনদের; **মে**—আমার; **স্নেহ-পাশম্**—স্নেহের বন্ধন; **ইমম্**—এই; **ছিন্ধি**—ছিন্ন কর; **দৃঢ়ম্**—গভীর; **পাণ্ডুষু**—পাণ্ডবদের জন্য; **বৃষ্ণিষু**—বৃষ্ণি বা যাদবদের জন্য।

অনুবাদ

হে জগদীশ্বর, হে সর্বান্তর্যামী, হে বিশ্বরূপ, দয়া করে তুমি আমার আত্মীয়-স্বজন, পাণ্ডব এবং যাদবদের প্রতি গভীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে দাও।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধভক্ত ভগবানের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছু চাইতে লজ্জাবোধ করেন। কিন্তু পারিবারিক স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে গৃহস্থদের কখনো কখনো ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করতে হয়। কুন্তীদেবী এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, পাণ্ডব এবং বৃষ্ণিদের সঙ্গে

তাঁর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। পাণ্ডবেরা ছিলেন তাঁর নিজের পুত্র এবং বৃষ্ণিরা ছিলেন তাঁর পিতৃবংশীয়। শ্রীকৃষ্ণ উভয় পরিবারের সঙ্গেই সমভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। উভয় পরিবারেরই ভগবানের সহায়তার প্রয়োজন ছিল, কেননা উভয় পরিবারই ছিলেন ভগবানের শরণাগত ভক্ত। কুন্তীদেবী অভিলাষ করেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুত্র পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকেন, কিন্তু তাহলে তাঁর পিতৃকুল শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হত। এই ধরনের পক্ষপাত কুন্তীদেবীর মনকে বিচলিত করেছিল, এবং তাই তিনি স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করার বাসনা করেছিলেন।

শুদ্ধভক্ত তাঁর পরিবারের সীমিত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে সমস্ত বিস্তৃত আত্মাদের জন্য ভক্তিযোগে তাঁর সেবার পরিধি বিস্তার করেন। তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ষড়গোস্বামীগণ, যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পথ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত জ্ঞানী এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁরা তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। পারিবারিক স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করার অর্থ হচ্ছে কার্যকলাপের পরিধি বিস্তার করা। তা না করে কেউই ব্রাহ্মণ, রাজা, জননেতা অথবা ভগবদ্ভক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। একজন আদর্শ রাজারূপে পরমেশ্বর ভগবান সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজার গুণাবলী প্রকাশ করার জন্য তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ, ভগবদ্ভক্ত, রাজা অথবা জননেতাকে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের জন্য অবশ্যই অত্যন্ত উদার মনোভাবাপন্ন হতে হয়। শ্রীমতী কুন্তীদেবী এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এবং তাই তিনি দুর্বল হওয়ার ফলে তাঁর পারিবারিক স্নেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবানকে এখানে *বিশ্বেশ* বা *বিশ্বাত্মন্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, এবং তার মাধ্যমে এটিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে পারিবারিক স্নেহের বন্ধনের গ্রন্থি ছিন্ন করার সমস্ত শক্তি তাঁর রয়েছে। তাই কখনো কখনো দেখা যায় যে দুর্বল ভক্তদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের ফলে তিনি তাঁর সর্বশক্তিমত্তার দ্বারা সৃষ্ট বিশেষ পরিস্থিতির চাপের মাধ্যমে তাঁদের পারিবারিক স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করেন। সেটি করার মাধ্যমে তিনি ভক্তকে তাঁর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে বাধ্য করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথটি প্রশস্ত করেন।

শ্লোক ৪২

ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥ ৪২ ॥

ত্বয়ি—তোমাকে; **মে**—আমার; **অনন্য-বিষয়া**—একনিষ্ঠ; **মতিঃ**—মনোনিবেশ; **মধুপতে**—হে মধুপতি; **অসকৃৎ**—নিরবচ্ছিন্নভাবে; **রতিম্**—আকর্ষণ; **উদ্বহতাৎ**—প্রবাহিত হোক; **অদ্ধা**—সরাসরিভাবে; **গঙ্গা**—গঙ্গা; **ইব**—মতো; **ওঘম্**—প্রবাহিত হয়; **উদন্বতি**—সমুদ্রে।

অনুবাদ

হে মধুপতি, গঙ্গা যেমন অপ্রতিহতভাবে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তেমনই আমার একনিষ্ঠ মতি যেন নিরন্তর তোমাতেই আকৃষ্ট হয়।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্তির পূর্ণতা তখনই লাভ হয় যখন সমস্ত চেতনা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবার প্রতি একাগ্রীভূত হয়। অন্য সমস্ত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করার অর্থ অন্যের প্রতি স্নেহাদি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি নয়। সেটি কখনো সম্ভব নয়। একটি জীব, সে যেই হোক না কেন, অন্যের প্রতি তার এই স্নেহের অনুভূতি অবশ্যই থাকবে, কেননা সেটিই হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। বাসনা, ক্রোধ, লোভ, আকর্ষণ ইত্যাদি জীবনের লক্ষণগুলিকে বিনাশ করা যায় না। কেবল তার উদ্দেশ্যের পরিবর্তন করতে হয়। বাসনা কখনো ত্যাগ করা যায় না, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে এই বাসনা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধনের পরিবর্তে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা হয়। পরিবার, সমাজ, দেশ ইত্যাদির প্রতি তথাকথিত প্রীতি হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিভিন্ন অবস্থা। যখন এই বাসনা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে বলা হয় ভগবদ্ভক্তি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আমরা দেখতে পাই যে অর্জুন তাঁর নিজের সন্তুষ্টির জন্য তাঁর ভ্রাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাননি। কিন্তু যখন তিনি ভগবানের বাণী, অর্থাৎ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করলেন, তখন তিনি তাঁর সেই মত পরিবর্তন করেছিলেন এবং ভগবানের সেবা করেছিলেন। আর তা করার ফলে তিনি ভগবানের বিখ্যাত ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন, যার জন্য সমস্ত শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে তিনি ভগবানের সখারূপে ভগবদ্ভক্তি যাজনের মাধ্যমে পারমার্থিক

বলে ভগবানকে মনে করেছিল, তবুও সে ছিল বৈকুণ্ঠের ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক এবং তাই হিরণ্যকশিপু এত কষ্ট করে যে সিংহাসনটি তৈরি করেছিল তাতে উপবেশন করতে ভগবান একটুও ইতস্তত করেননি। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, কখনও কখনও বড় বড় মহাত্মা এবং ঋষিরা বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র সহকারে ভগবানকে মূল্যবান আসন নিবেদন করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান সেই সমস্ত সিংহাসনে উপবেশন করেন না। কিন্তু হিরণ্যকশিপু পূর্বে ছিল বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়, এবং যদিও ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে সে অধঃপতিত হয়েছিল এবং আসুরিক বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং যদিও হিরণ্যকশিপুরূপে সে ভগবানকে কোন কিছু নিবেদন করেনি, তবুও ভগবান এতই ভক্তবৎসল যে, তিনি হিরণ্যকশিপুর সৃষ্ট সিংহাসনে প্রসন্নতাপূর্বক আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বুঝতে হবে যে, ভগবদ্ভক্ত জীবনের যে কোন অবস্থাতেই সৌভাগ্যবান।

শ্লোক ৩৫

নিশাম্য লোকত্রয়মস্তকজ্বরং
তমাদিদৈত্যং হরিণা হতং মৃধে ।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতানना মুহুঃ
প্রসূনবর্ষৈর্ববৃষুঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

নিশাম্য—শ্রবণ করে; **লোক-ত্রয়**—ত্রিলোকের; **মস্তক-জ্বরম্**—মাথাব্যথা; **তম্**—তাকে; **আদি**—মূল; **দৈত্যম্**—দৈত্য; **হরিণা**—ভগবান কর্তৃক; **হতম্**—নিহত হয়েছে; **মৃধে**—যুদ্ধে; **প্রহর্ষ-বেগ**—আনন্দের ফলে; **উৎকলিত-আননাঃ**—প্রফুল্লানন; **মুহুঃ**—বার বার; **প্রসূন-বর্ষৈঃ**—পুষ্পবৃষ্টির দ্বারা, **ববৃষুঃ**—বর্ষণ করেছিলেন; **সুর-স্ত্রিয়ঃ**—দেবপত্নীগণ।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু ত্রিলোকের শিরঃপীড়া সদৃশ ছিল। তাই স্বর্গের দেবপত্নীগণ যখন দেখলেন যে, সেই মহা অসুর ভগবানের হস্তে নিহত হয়েছে, তখন তাঁদের মুখমণ্ডল পরম আনন্দে বিকশিত হয়েছিল। তাঁরা তখন স্বর্গ থেকে নৃসিংহদেবের উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ—হে শ্রীকৃষ্ণ; **কৃষ্ণ-সখ**—হে অর্জুনের সখা; **বৃষ্ণি**—বৃষ্ণিকুলের; **ঋষভ**—হে শ্রেষ্ঠ; **অবনী**—পৃথিবী; **ধ্রুক্**—বিদ্রোহী; **রাজন্য-বংশ**—রাজবংশ; **দহন**—হে সংহারক; **অনপবর্গ**—ক্ষয়হীন; **বীর্য**—বল; **গোবিন্দ**—হে গোলোকপতি; **গো**—গাভী; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **সুর**—দেবতা; **আর্তি-হর**—দুঃখ বিনাশকারী; **অবতার**—হে অবতরণকারী; **যোগ-ঈশ্বর**—সমস্ত যোগের ঈশ্বর; **অখিল**—সমগ্র জগতের; **গুরো**—হে গুরু; **ভগবন্**—হে সমগ্র ঐশ্বর্যের ঈশ্বর; **নমঃ তে**—তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে শ্রীকৃষ্ণ, হে অর্জুনের সখা, হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে উৎপাতকারী রাজন্যবর্গের তুমি বিনাশকারী। তুমি অক্ষয় বীর্য, তুমি গোলোকাধিপতি। গাভী, ব্রাহ্মণ এবং ভক্তদের দুঃখ দূর করার জন্য তুমি অবতরণ কর। তুমি যোগেশ্বর, জগদ্‌গুরু, সর্বশক্তিমান ভগবান, এবং তোমাকে আমি বারবার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীমতী কুন্তীদেবী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করেছেন। সর্বশক্তিমান ভগবানের নিত্য চিন্ময় ধাম রয়েছে, যেখানে তিনি সুরভি গাভীদের পালন করেন। সেখানে শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবী তাঁর সেবা করেন। সেখান থেকে তিনি এই জড় জগতে অবতরণ করেন তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করার জন্য এবং উপদ্রবকারী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি ও যারা শাসন করার নামে জনসাধারণকে শোষণ করে সেইসব রাজাদের বিনাশ করার জন্য। তিনি তাঁর অনন্ত শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশ কার্য সাধন করেন, এবং তা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা পূর্ণশক্তিমান এবং তাঁর শক্তির কখনো ক্ষয় হয় না। গাভী, ব্রাহ্মণ এবং তাঁর ভক্তেরা তাঁর বিশেষ মনোযোগের বিষয়, কেননা জীবের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের জন্য তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ৪৪

সূত উবাচ

পৃথয়েত্থং কলপদৈঃ পরিণূতাখিলোদয়ঃ ।
মন্দং জহাস বৈকুণ্ঠো মোহয়ন্নিব মায়য়া ॥ ৪৪ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **পৃথয়া**—পৃথা (কুন্তী) কর্তৃক; **ইত্থম্**—এই; **কলপদৈঃ**—সুনির্বাচিত শব্দমালার দ্বারা; **পরিষ্কৃত**—পূজিত হয়ে; **অখিল**—সমগ্র জগতের; **উদয়ঃ**—মহিমা; **মন্দম্**—মৃদুভাবে; **জহাস**—হেসে; **বৈকুণ্ঠঃ**—ভগবান; **মোহয়ন্**—মোহিত করে; **ইব**—মতো; **মায়য়া**—মায়াশক্তির প্রভাবে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে সুনির্বাচিত শব্দমালার দ্বারা রচিত কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাবে শ্রবণ করে মৃদু হাসলেন। সেই হাসি তাঁর যোগশক্তির মতোই ছিল মনোমুগ্ধকর।

তাৎপর্য

এই জগতে যা কিছু আকর্ষণীয় বা মনোমুগ্ধকর, তা ভগবানের অভিব্যক্তি বলে কথিত হয়ে থাকে। যে সমস্ত বদ্ধ জীব জড় জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় ব্যস্ত, তারাও তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে বিমোহিত হয়। কিন্তু তাঁর ভক্তেরা ভিন্নভাবে তাঁর মহিমার দ্বারা মোহিত হন, এবং তাঁর কৃপাপূর্ণ আশীর্বাদ তাঁদের উপর বর্ষিত হয়। বিদ্যুৎশক্তি যেমন বিভিন্নভাবে কার্য করে, তেমনই তাঁর শক্তিও বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত হয়। কুন্তীদেবী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি তাঁর মহিমা আংশিকভাবেও ব্যক্ত করতে পারেন। তাঁর সমস্ত ভক্তরা এইভাবে সুনির্বাচিত শব্দের দ্বারা মহিমা কীর্তনের মাধ্যমে তাঁর আরাধনা করেন, এবং তাই তিনি উত্তমশ্লোক নামে খ্যাত। যতই সুনির্বাচিত শব্দের দ্বারা তাঁর মহিমা কীর্তন করা হোক না কেন, তা যথাযথভাবে তাঁর গুণকীর্তনের জন্য যথেষ্ট নয়। তথাপি, শিশুপুত্রের আধোবুলি শ্রবণ করে পিতা যেমন সন্তুষ্ট হন, ভগবানও তেমন এই ধরনের প্রার্থনায় প্রসন্ন হন। *মায়া* শব্দটি মোহ এবং কৃপা দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে *মায়া* শব্দটি কুন্তীদেবীর প্রতি ভগবানের কৃপার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্লোক ৪৫

তাং বাঢ়মিত্যুপামন্ত্র্য প্রবিশ্য গজসাহ্বয়ম্ ।
স্ত্রিয়শ্চ স্বপুরং যাস্যন্ প্রেম্না রাজ্ঞা নিবারিতঃ ॥ ৪৫ ॥

তাম্—সেই সমস্ত; **বাঢ়ম্**—গ্রহণ করে; **ইতি**—এইভাবে; **উপামন্ত্র্য**—পরে জানালেন; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **গজসাহ্বয়ম্**—হস্তিনাপুরের প্রাসাদ; **স্ত্রিয়ঃ চ**—অন্য

মহিলাদের; স্ব-পুরম্—নিজ আবাসস্থলে; যাস্যন্—গমনোদ্যত হলে; প্রেম্না—প্রেম ভরে; রাজ্ঞা—রাজা কর্তৃক; নিবারিতঃ—নিবারণ করলেন।

অনুবাদ

শ্রীমতী কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাবে গ্রহণ করে পরমেশ্বর ভগবান পরে হস্তিনাপুরের প্রাসাদে প্রবেশপূর্বক অন্যান্য মহিলাদের তাঁর বিদায়ের কথা জানালেন। কিন্তু তিনি গমনোদ্যত হলে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রেমভরে অনুনয় করে নিবারণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ফিরে যেতে মনস্থ করেছিলেন তখন তাঁকে হস্তিনাপুরে থাকতে বাধ্য করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু আরও কয়েকদিন সেখানে থাকার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সরল অনুরোধ তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রেমপূর্ণ স্নেহই ছিল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শক্তি, যা ভগবান উপেক্ষা করতে পারেননি। এইভাবে সর্বশক্তিমান ভগবান কেবল প্রেমময়ী সেবার দ্বারাই জিত হন, অন্য কোন উপায়ে নয়। তিনি তাঁর সমস্ত কার্যকলাপে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তের প্রেম পূর্ণ স্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করেন।

শ্লোক ৪৬

ব্যাসাদ্যৈরীশ্বরেহজ্ঞৈঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা।
প্রবোধিতোঽপীতিহাসৈর্নাবুধ্যত শুচার্পিতঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্যাস-আদ্যৈঃ—ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিদের দ্বারা; **ঈশ্বর**—সর্বশক্তিমান ভগবান; **ঈহা**—ইচ্ছার দ্বারা; **জ্ঞৈঃ**—বিজ্ঞদের দ্বারা; **কৃষ্ণেন**—স্বয়ং কৃষ্ণের দ্বারা; **অদ্ভুত-কর্মণা**—অলৌকিক কার্য সাধনকারী ব্যক্তি; **প্রবোধিতঃ**—সান্ত্বনা দান করে; **অপি**—যদিও; **ইতিহাসৈঃ**—ঐতিহাসিক প্রমাণাদির দ্বারা; **ন**—না; **অবুধ্যত**—তৃপ্ত; **শুচা অর্পিতঃ**—শোকাভিভূত।

অনুবাদ

ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিগণ এবং অদ্ভুতকর্মা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাস আদি শাস্ত্রসমূহের প্রমাণ উল্লেখপূর্বক উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও শোকসন্তপ্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির শান্তি পেলেন না।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে অসংখ্য গণহত্যা হয়েছিল সেজন্য পুণ্যাত্মা মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্যথাতুর ছিলেন, বিশেষ করে যেহেতু তাঁরই জন্য তা হয়েছিল। দুর্যোধন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল এবং সে ভালভাবেই রাজ্যশাসন করছিল, সুতরাং একদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ন্যায়ের বিচারে যুধিষ্ঠির ছিলেন রাজসিংহাসনের অধিকারী। সেই বিষয়টিই কেন্দ্র করে সমস্ত রাজনৈতিক দলাদলির সৃষ্টি হয়েছিল, এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত রাজারা এবং অধিবাসীরা প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাদের সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেখানে ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করে। মহাভারতের আদি পর্বে (২০) উল্লেখ করা হয়েছে যে আঠারো দিন ব্যাপী সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ৬৪০,০০০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছিল, এবং এছাড়া আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ নিখোঁজ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বিগত পাঁচ হাজার বছরে এটিই হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে বড় যুদ্ধ।

শুধুমাত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্যই এই গণহত্যা তাঁর কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল, তাই তিনি ব্যাসদেবের মতো মহর্ষিদের কাছ থেকে এবং স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে সেই যুদ্ধ যে ন্যায়সঙ্গত ছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের দ্বারা উপদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মহারাজ যুধিষ্ঠির সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্ভুতকর্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এই বিশেষ বিষয়ে তিনি এবং ব্যাসদেব উভয়েই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করতে পারেননি। তার অর্থ কি এই যে শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুতকর্মা নন? না, অবশ্যই নয়। তার অর্থ হচ্ছে যে পরমেশ্বর রূপে অথবা মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং ব্যাসদেব উভয়েরই হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপে ভগবান তার থেকেও অদ্ভুত কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, কেননা সেটিই ছিল ভগবানের ইচ্ছা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরমাত্মারূপে তিনি তাঁকে ব্যাসদেব এবং অন্যান্যদের এমন কি তাঁর নিজের বাণীর দ্বারাও আশ্বস্ত হতে দেননি, কেননা তিনি চেয়েছিলেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠির যেন তাঁর আর এক মহান ভক্ত মৃত্যু পথযাত্রী ভীষ্মদেবের উপদেশ শ্রবণ করেন। ভগবান চেয়েছিলেন যে জড় জগতে তাঁর অস্তিত্বের অন্তিম মুহূর্তে মহান যোদ্ধা ভীষ্মদেব যেন স্বয়ং তাঁকে এবং বর্তমানে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত মহারাজ যুধিষ্ঠির আদি তাঁর পৌত্রদের দর্শন করে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে দেহত্যাগ করতে পারেন। তাঁর প্রিয় পিতৃহীন পৌত্র পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা ভীষ্মদেবের ছিল না। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা হচ্ছেন অত্যন্ত

ন্যায়-পরায়ণ, এবং তাই তিনি দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেননা তিনি দুর্যোধনের অর্থে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। তাছাড়া ভগবান এটিও চেয়েছিলেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবের বাণীর দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করুন, যার ফলে সমস্ত জগৎ দেখতে পাবে যে ভীষ্মদেবের জ্ঞান অন্য সকলের জ্ঞানকে অতিক্রম করেছিল, এমন কি পরমেশ্বর ভগবানেরও।

শ্লোক ৪৭

আহ রাজা ধর্মসুতশ্চিন্তয়ন্ সুহৃদাং বধম্।
প্রাকৃতেনাত্মনা বিপ্রাঃ স্নেহমোহবশং গতঃ ॥ ৪৭ ॥

আহ—বললেন; **রাজা**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **ধর্মসুতঃ**—ধর্ম (যমরাজ) পুত্র; **চিন্তয়ন্**—চিন্তা করে; **সুহৃদাম্**—আত্মীয় ও বন্ধুদের; **বধম্**—হত্যা করে; **প্রাকৃতেন**—কেবল জড় ধারণার দ্বারাই; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **স্নেহ**—স্নেহ; **মোহ**—মোহ; **বশম্**—বশীভূত হয়ে; **গতঃ**—গিয়ে।

অনুবাদ

হে মুনিগণ, ধর্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের মৃত্যুতে সাধারণ জাগতিক মানুষের মতো শোকাভিভূত হয়েছিলেন, এবং এইভাবে স্নেহ ও মোহের বশীভূত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

যদিও মহারাজ যুধিষ্ঠির যে একজন সাধারণ মানুষের মতো শোকাভিভূত হবেন এটি আশা করা যায়নি, তথাপি ভগবানের ইচ্ছায় তিনি জাগতিক স্নেহের বশে মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন (ঠিক যেমন অর্জুনকে আপাতভাবে মোহাচ্ছন্ন বলে মনে হয়েছিল)। দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষ ভালভাবেই জানেন যে জীব তার দেহ অথবা মন নয়, পক্ষান্তরে সে জড়াতীত। সাধারণ মানুষ শরীরের ভিত্তিতে হিংসা এবং অহিংসার বিচার করে, কিন্তু সেটি হচ্ছে এক প্রকার মোহ। প্রতিটি ব্যক্তি তার বৃত্তি অনুসারে কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে ন্যায্য কারণে যুদ্ধ করা, তা বিরোধী পক্ষ যেই হোক না কেন। এই প্রকার কর্তব্য সম্পাদনে আত্মার বাহ্যিক বসন স্বরূপ জড় দেহের বিনাশে তাদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তিনি একজন সাধারণ

মানুষের মতো মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাঁর পিছনে ভগবানের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল ঃ অর্জুনকে যেমন তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন, তেমনই ভীষ্মদেবের দ্বারা তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেওয়ার আয়োজন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

অহো মে পশ্যতাজ্ঞানং হৃদিরূঢ়ং দুরাত্মনঃ ।
পারক্যস্যৈব দেহস্য বহ্ব্যো মেঽক্ষৌহিণীর্হতাঃ ॥ ৪৮ ॥

অহো—হায়; মে—আমার; পশ্যত—দেখ; অজ্ঞানম্—অজ্ঞানতা; হৃদি—হৃদয়ে; রূঢ়ম্—স্থিত; দুরাত্মনঃ—পাপিষ্ঠদের; পারক্যস্য—অন্যদের জন্য; এব—অবশ্যই; দেহস্য—দেহের; বহ্ব্যঃ—বহু বহু; মে—আমার দ্বারা; অক্ষৌহিণীঃ—অক্ষৌহিণী সেনাবাহিনী; হতাঃ—নিহত হয়েছে।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন, হায়! আমি অত্যন্ত পাপিষ্ঠ! আমার হৃদয় গভীর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন! এই দেহ, যা অবশেষে অন্যদের ভক্ষ্য, তারই জন্য আমি বহু বহু অক্ষৌহিণী সেনা বধ করেছি।

তাৎপর্য

২১, ৮৭০টি রথ, ২১,৮৭০টি হস্তী, ১০৯,৩৫০টি পদাতিক এবং ৬৫,৬০০টি অশ্বারোহী সৈনিকদের নিয়ে একটি অক্ষৌহিণী হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বহু অক্ষৌহিণীর বিনাশ হয়েছিল। পৃথিবীর সবচাইতে পুণ্যবান রাজা মহারাজ যুধিষ্ঠির এই অসংখ্য জীবের হত্যার জন্য নিজেকে দায়ী বলে মনে করেছিলেন, কেননা সেই যুদ্ধ হয়েছিল তাঁকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য। এই শরীরটি প্রকৃতপক্ষে অন্যের উপকারের জন্য। এই শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরোপকার করা; আর যখন তার মৃত্যু হয় তখন এই শরীরটি কুকুর, শৃগালের ভক্ষ্য হয়। এই অনিত্য শরীরের জন্য এই বিরাট হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল বলে তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৯

বালদ্বিজসুহৃন্মিত্রপিতৃভ্রাতৃগুরুদ্রুহঃ ।
ন মে স্যান্নিরয়ান্মোক্ষো হ্যপি বর্ষাযুতাযুতৈঃ ॥ ৪৯ ॥

বাল—বালকেরা; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **মিত্র**—বন্ধুগণ; **পিতৃ**—পিতৃতুল্য; **ভ্রাতৃ**—ভ্রাতাগণ; **গুরু**—গুরুজন; **দ্রুহঃ**—হত্যাকারী; **ন**—কখনই নয়; **মে**—আমার; **স্যাৎ**—হবে; **নিরয়াৎ**—নরক থেকে; **মোক্ষঃ**—মুক্তি; **হি**—অবশ্যই; **অপি**—যদিও; **বর্ষ**—বৎসর; **অযুত-অযুতৈঃ**—লক্ষ লক্ষ।

অনুবাদ

আমি বহু বালক, ব্রাহ্মণ, সুহৃদ, সখা, পিতৃব্য, গুরুজন এবং ভ্রাতাদের বধ করেছি। তাই এই সমস্ত পাপের ফলে আমার জন্য যে নরক বাস আসন্ন, লক্ষ লক্ষ বছর জীবিত থাকলেও তা থেকে আমার মুক্তি হবে না।

তাৎপর্য

যখনই কোন যুদ্ধ হয় তখন বালক, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোকদের মতো বহু নিরীহ জীবের মৃত্যু হয়, যাদের হত্যা মহাপাপ বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁরা সকলেই নিরীহ প্রাণী, এবং শাস্ত্রে সর্ব অবস্থাতেই তাঁদের হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই গণহত্যা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। আর তা ছাড়া সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বহু বন্ধু, গুরুজন এবং আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, এবং তাঁরা সকলেই নিহত হয়েছিলেন। তাঁর কাছে এইভাবে হত্যা করার কথা চিন্তা করাও ছিল ভয়ঙ্কর এবং তাই তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁকে কোটি কোটি বছর নরকে থাকতে হবে।

শ্লোক ৫০

নৈনো রাজ্ঞঃ প্রজাভর্তুর্ধর্মযুদ্ধে বধো দ্বিষাম্ ।
ইতি মে ন তু বোধায় কল্পতে শাসনং বচঃ ॥ ৫০ ॥

ন—না; **এনঃ**—পাপ; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **প্রজা-ভর্তুঃ**—প্রজাপালক; **ধর্ম**—ন্যায়-সঙ্গত; **যুদ্ধে**—সমরে; **বধঃ**—হত্যা; **দ্বিষাম্**—শত্রুদের; **ইতি**—এই সমস্ত; **মে**—আমাকে; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **বোধায়**—সান্ত্বনার নিমিত্ত; **কল্পতে**—পরিচালনার জন্য; **শাসনম্**—নির্দেশ; **বচঃ**—বাণী।

অনুবাদ

ন্যায়সঙ্গত কারণে প্রজাপালক রাজা শত্রু বধ করলে কোন পাপ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রের এই সমস্ত অনুশাসন আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির মনে করেছিলেন যে রাজ্যশাসনের ব্যাপারে তিনি প্রকৃতপক্ষে যুক্ত ছিলেন না; দুর্যোধন সেই কার্য ভালভাবেই সম্পাদন করছিল এবং প্রজারা সুখেই ছিল, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত লাভের জন্য দুর্যোধনের হাত থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিতে গিয়ে এতগুলি প্রাণীর হত্যা সংঘটিত হয়েছিল। শাসনকার্যের উদ্দেশ্যে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়নি, পক্ষান্তরে নিজের অধিকার বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তা হয়েছিল, এবং তাই তিনি নিজেকে এই সমস্ত পাপের জন্য দায়ী বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৫১

স্ত্রীণাং মদ্ধতবন্ধূনাং দ্রোহো যোঽসাবিহোত্থিতঃ ।
কর্মভির্গৃহমেধীয়ৈর্নাহং কল্পো ব্যপহিতুম্ ॥ ৫১ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীলোকদের; **মৎ**—আমার দ্বারা; **হত-বন্ধূনাম্**—নিহত বন্ধুদের; **দ্রোহঃ**—শত্রুতা; **যঃ**—যা; **অসৌ**—এই সমস্ত; **ইহ**—এর সঙ্গে; **উত্থিতঃ**—উদ্ভূত; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা; **গৃহমেধীয়ৈঃ**—জড় উন্নতি সাধনে মগ্ন ব্যক্তিদের দ্বারা; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **কল্পঃ**—প্রত্যাশা; **ব্যপহিতুম্**—অপনোদন করা।

অনুবাদ

আমি স্ত্রীলোকেদের বহু পতি ও বান্ধবকে বধ করেছি, এবং এইভাবে আমি এতই শত্রুতার সৃষ্টি করেছি যে জড়জাগতিক কল্যাণ সাধনের দ্বারা তা অপনোদন করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

গৃহমেধী হচ্ছে তারা যারা কেবল জড়জাগতিক উন্নতির জন্য সৎ কর্ম করে। এই প্রকার জড়জাগতিক উন্নতি কখনো কখনো জাগতিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে যাওয়া পাপকর্মের ফলে ব্যাহত হয়। এই প্রকার পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বেদে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেদে বলা হয়েছে যে অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়।

যুধিষ্ঠির মহারাজ এই অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে এই মহাপাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধে স্ত্রীলোকের পতি, ভ্রাতা, এমনকি কখনো কখনো পিতা এবং পুত্রও অংশগ্রহণ করতে যান। তাদের যখন মৃত্যু হয় তখন নতুন শত্রুতার সৃষ্টি হয়, এবং তার ফলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চক্র বৃদ্ধি পায় যা সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলেও নিবারণ করা যায় না।

কর্ম এমনই; একটি কর্ম একই সঙ্গে ক্রিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে কর্মের অনুষ্ঠানকারীকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭-২৮) তার নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এই কর্ম যখন পরমেশ্বর ভগবানের জন্য সম্পাদিত হয়, তখনই কেবল কর্ম ও কর্মফলের এই পন্থা রোধ করা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটি প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, এটি তাঁর নিজের উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়, এবং তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল যুধিষ্ঠির মহারাজ হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডবদের কোন পাপই স্পর্শ করতে পারেনি, যাঁরা ছিলেন কেবল ভগবানের আজ্ঞা পালনকারী। যারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাদেরই সেই যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব বহন করতে হয়।

শ্লোক ৫২

যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভঃ সুরয়া বা সুরাকৃতম্ ।
ভূতহত্যাং তথৈবৈকাং ন যজ্ঞৈর্মার্ষ্টুমর্হতি ॥ ৫২ ॥

যথা—যেমন; **পঙ্কেন**—কর্দমের দ্বারা; **পঙ্ক-অম্ভঃ**—পঙ্কিল জল; **সুরয়া**—সুরার দ্বারা; **বা**—অথবা; **সুরাকৃতম্**—সুরা স্পর্শজনিত অপবিত্রতা; **ভূতহত্যাম্**—প্রাণী বধ; **তথা**—তেমন; **এব**—অবশ্যই; **একাম্**—এক; **ন**—না; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **মার্ষ্টুম্**—রোধ করা; **অর্হতি**—সম্ভব।

অনুবাদ

কর্দমের দ্বারা যেমন কর্দমাক্ত জল পরিশ্রুত করা যায় না অথবা সুরার দ্বারা যেমন সুরা-কলঙ্কিত পাত্র পবিত্র করা যায় না, তেমনই যজ্ঞে পশুবধ করে নরহত্যাজনিত পাপও রোধ করা যায় না।

তাৎপর্য

অশ্বমেধ-যজ্ঞ বা গোমেধ-যজ্ঞ অবশ্যই পশুবধের জন্য অনুষ্ঠান করা হত না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে যজ্ঞবেদীতে সেই পশুবলির ফলে পশুদের নতুন জীবন দান করা হত। বৈদিক মন্ত্রের অভীষ্ট ফল প্রদানের ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্যই কেবল তা করা হত। যথাযথভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার ফলে অনুষ্ঠানকারী নিশ্চিতভাবে পাপের ফল থেকে মুক্ত হন, কিন্তু কোন অক্ষম ব্যক্তি অনুপযুক্ত বিধিতে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলে তাকে অবশ্যই পশুহত্যার জন্য দায়ী হতে হয়। কলহ এবং কপটতার এই যুগে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মতো সুদক্ষ কোন ব্রাহ্মণ না থাকায় এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাই কলিযুগের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কলিযুগের একমাত্র যজ্ঞ হচ্ছে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্তিত হরিনাম-যজ্ঞ। কিন্তু তা বলে পশুহত্যা করে সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য হরিনাম-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা কখনো নিজেদের স্বার্থে পশুহত্যা করেন না এবং ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সম্পাদনেও তাঁরা অবহেলা করেন না (যে আদেশ ভগবান অর্জুনকে দিয়েছেন)। তাই ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে যখন সব কিছু সম্পাদন করা হয়, তখন সমস্ত উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। সেটি কেবল ভক্তদের পক্ষেই সম্ভব।

ইতি "কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।